দোল - এক দশক

২০১০ থেকে ২০ পর্যন্ত গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত দোলের লেখাপত্তর

গুরুচণ্ডা৯
www.guruchandali.com

ছবিঃ বিনায়ক রুকু

আলো

পাই

১০ এপ্রিল ২০১১

এখানে আকাশ নীল।

নীলের বাড়াবাড়িই। বাড়াবাড়ি তো সবই। বড়বড় ও। এক্স এক্স এল। এক্স এস খুঁজে পাওয়া দায়। আর এদিকে সব এক্সেস। যেদিকে তাকাও। উপরে তাকাও তো এক্সেল কাচা এক্সট্রা হোয়াইট মেঘ। মুখ তুলে তাকাও তো এক্সট্রা হোয়াইটেনিং টুথপেস্টচর্চিত স্মাইল। সামনে তাকাও তো সুপার স্বচ্ছ দরজা। দরজা যে আদৌ আছে তা ই বোঝা দায়। প্রথম কদিন তো দুর্যোধনবাবুর ইন্দ্রপ্রস্থ ভ্রমণসমদশা।

এমনকি চাঁদটাকেও প্রথম কোজাগরীতে দেখে বোমকে গেছিলাম। একেই কি বলে সুপারমুন?

সুপারমুন, সুপারম্যান, সুপারসাইজ, সুপারবউল, সুপারস্টোর, সুপারপাওয়ার...বলতে গেলে কেমনি সুপারলাইকই করে ফেলছিলাম। করবনা?

পিকচার ম্যানেজার ট্যানেজারের দরকার টরকারই নেই। ব্রাইটনেস, ক¾ট্রাস্ট সব অটো অ্যাডজাস্ট হয়ে বসে আছে। প্রি কি পোস্ট প্রসেসিং বিলকুল অপ্রয়োজনীয়। সুপারস্টোরের ট্রলিতে ভরি প্রসেসড ফুড। ক্যামেরায় ভরি প্রসেসড ছবি।অসুপারলাইক।

নির্মেঘ নিকোনো নীলের ব্যাকগ্রাউণ্ডে কখনো ঝুলন্ত ডগ টিউলিপের ফুটফুটে গোলাপি কনট্রাস্ট, কখনও বা জেটের সুপার সফেদ ফেনিল ট্রেইলের কাটাকুটির কেরামতি।অঠিক অমনিতর সফেন নীল সাগরজলের কনট্রাস্টে ঠিক অমনপানা সাদা ডানা ভাসানো সিগাল।

বাঁধানো রাস্তার ধারে সাজানো লাল নীল সবুজের মেলা। উজ্জ্বল হালকা সবুজ ঘাস, উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ পাতা। সেই রেডিমেড কনট্রাস্টে আরও ব্রাইট লাগে।

ব্রাইট, চকচকে।

এ দেশটা শাইনিং।

এক চিলতে ধুলো নেই।

এখানে আকাশের গায়েও ধুলো নেই।

চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

কী ব্রাইট, কী চকচকে, কী শাইনিং।

এখানে রোদের গায়েও ধুলো নেই।

সিগালের ডানায় রোদের গন্ধ কী চড়া।

রোদে ভরে যায় আমার চারপাশ।

আমি ঐ রোদকে ক্যামেরায় ভরি।

ক্যামেরা ভরে যেতে থাকে।

ছবি আর ছবিতে।

ঝকঝকে হাসি, চকচকে লোকজন, ঝকঝকে রোদ্দুর, চকচকে আকাশ- শাইনিং এক শহরের ছবি।

আর, তারপর একদিন দেখি, আসলে আমার কোন শহরই নেই। আছে কেবল শহরের ছবি।অআমি ছবি তুলে চলেছি কতগুলো ছবির।

সব ই তো ছবির মতন।

সবাই তো ছবির মতন।

ছবির মতন সুন্দর। পিকচারপারফেক্ট।

আর বেসিক্যলি আমি সেই ছবির ছবি তুলে চলেছি। এক ছবি থেকে আরেক ছবিতে চলে বেড়াচ্ছি। এক ছবি থেকে আরেক ছবিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ধাক্কা খাচ্ছি। একটা ছবি পেরিয়ে আরেকটা ছবির মুখে পড়ছি। একটা ছবির পিছনে ঘুরতে ঘুরতে আরেকটা ছবির সামনে গিয়ে পড়ছি।

সব পিকচারপারফেক্ট।

খাপে খাপ।

ডিসক্রিট।

কোন ভীড় নেই। তাই কোন মিশে যাওয়া ও নেই।

কোন মীড় নেই।

সব আলাদা আলাদা। একক। ইন্ডিভিজ্যুয়াল। সবাই একক।। সবাই একা।

কোন ভীড় নেই।

কেবল ছবির ভীড়।

আমি হাঁপিয়ে যাই। কিছু ছবির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে। আমি সারাদিন কেবল একটা ছবি থেকে আরেকটা ছবিতে ঘুরি।

হাঁপিয়ে যাই।

আমি কোন শহর খুঁজে পাই না।

আমি আমার শহরকে খুঁজে পাই না।

আমি ধুলো খুঁজতে শুরু করি। একটু কম ব্রাইটনেস। একটু কম কনট্রাস্ট।

একটু কম বাড়াবাড়ি।

ছবিগুলো পোস্ট প্রসেস করতে শুরু করি। আলো কমাই। শার্পনেস কমাই। স্যাচুরেশন কমাই।

ক্রপ করা শুরু করি। কাটাকুটি করে সব এদিক ওদিক এলোমেলো করে দিই। খাপ থেকে খাপ সরিয়ে একের খোপে অন্যকে ঢোকাতে থাকি। আর এইসব ছবি আপ্লোড করে আলবাম নিয়ে নাড়াচাড়া করি। শহরের মধ্যে আর ছবি খুঁজিনা। এই ছবিগুলোর মধ্যে একটু একটূ করে শহরকে খুঁজতে থাকি।

পাই ও কি?

~~~

আমি দোকানে গিয়ে এক রোদ চশমা খুঁজে আনি। তাকে দেখতে বড় বাজে। কিন্তু তাকে দিয়ে দেখতে বড় ভাল লাগে।

চশমাটা একটু আধটু ম্যাজিক জানে। রোদ্দুরকে নরম করে দিতে জানে। চারপাশ আর অমনি পরিষ্কার ঠেকে না। অনেক অনুজ্জ্বল। একটু মরা মরা। একটু পুরান। একটু হলুদ মেশান সেপিয়া টোন।

আমার খারাপ লাগা গুলো একটু একটু কমে।

এমনকি আমি অল্প অল্প রিনরিনে ভাললাগা ও পাই।

ম্যাজিক?

আর তাই থেকেই আইডিয়াটা আসে।

আমি আবার ক্যামেরা ধরি। ক্যামেরা দিয়েই দেখা শুরু করি। একটু ম্যাজিক ক'রে।অফিল্টার লাগিয়ে।

প্রি-প্রসেস করি। পোস্ট প্রসেসের কারিকুরি জারি করি ছবি তোলার সময় ই।

জলের উপর রোদ্দুরকে হীরের কুচি বানিয়ে দি। চাঁদে লাগাই ঝিলের জলের জোয়ার। ন্যাড়া মেপলের ডাল দিয়ে তার ক্ষত-বিক্ষত গালে আরো আঁচড় কেটে দি। ঝকঝকে সূর্যাস্তকে বিষণ্ন করে দি।

সেই বিষণ্ন আলো এসে পড়ে ধবধবে সাদা বি এম ডব্লুর উপর। একলা পাতা ঝরানো গাছের নিচে সে দু:খী দু:খী একলা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার বাড়ি ফেরার সেপিয়া রাস্তায়।

বিকেলটা দু:খী হয়ে যায়।

আমি অল্প চিনচিনে সুখ পাই।

~~~

বাড়ি ফিরতে গিয়ে ফুটপাথে দেখি চারটে স্ল্যাব। তৈরি হয়ে গেছে এক কোয়াড্‌র্‌যান্ট। নিজের ছায়াকে প্লেস ক রে দি থার্ড কোয়াড্‌র্‌যান্টে। একটা শুকনো ঝরা পাতাকেও একটু সরিয়ে নিয়ে আসি, আমার পাশে। রেসিডেন্টস অব দ্য থার্ড কোয়াড্‌র্‌যান্ট।

নিজেকে ঠিকঠাক দু:খের কো-অর্ডিনেটে প্লেস ক রে ভারি একটা সুখ হয়।

একঘর ভর্তি আলো থেকে এক চিলতে আলো তুলে নিয়ে বাকিটা ফেলে দি।

ছাপোষা নিয়ন আলোর সন্ধেকে ভিজিয়ে দি সোডিয়ামের হলুদ বাষ্পে।

বৃষ্টিদিনের কান্নার ফোঁটাটুকুকে পষ্ট ফোকাসে রাখি। বাকি সবকিছু কান্নাভেজা ঝাপসা করে দি।

রাতের আলোর সামনে শাটার স্পিড কমিয়ে দি। চলন্ত গাড়ি থেকে তোলা ছবিতে আলোগুলো সব আঁকাবাঁকা রেখা হয়ে যায়। ক্যামেরা নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমি আমার মত ছবি আঁকি। একটার সাথে আরেকটা আলো মিশে যায়। আর ডিস্ক্রিট নেই কিছু। সব মিশে যায়।অআমি আমার মত ছবি আঁকি। ছবিতে গল্প।

আবার কখনো বা সেই রাতের আলোর সামনে শাটার স্পিড বাড়িয়ে দি। আয়পারচার ছোট করি। আশপাশ থেকে আর সব মুছে দি। জেগে থাকে কেবল সাঁঝবাতিগুলো। সেই সাঁঝবাতির আলোর মুখোমুখি বসে আমি প্রাণহীন শহরের রূপকথা খুঁজতে থাকি। সাঁঝবাতির রূপকথারা আমাকে দু'দণ্ড শান্তি দ্যায়।

কেমন ম্যাজিক?

পচা ম্যাজিক। ধুর! ম্যাজিক তেমন করতে পারি কই? ম্যাজিকের ট্রিক তেমন জানি কই? বই খুলে টের পাই, কথা বলে চলেছি, অথচ ভাষার ব্যাকরণই শিখি নাই! আমার নড়বড়ে লজ্ঝড়ে ক্যামেরায় ফোকাস হারিয়ে হারিয়ে যায়। আমাকে ব্যাকরণবিদেরা বলেন, লেন্স কেনো, নিয়ম মানো, টেকনিক শেখো।

অক্ষমের আস্ফালনে বলি, টেকনিক, টেকনিক! তোমার মন নাই ফোটোগ্রাফি?

আর তখনই সেই সত্যিকারের ম্যাজিকটা হয়।

~~~

দেখি,অবাক হয়ে দেখি, এইসব প্রি পোস্ট প্রসেসিং এর আডজাস্টমেণ্ট ও আর আমাকে করতে হয়না।অএলোমেলো এ সব কিছুই একটু একটু করে খুঁজে পেতে থাকি। দেখি, সব তো এলোমেলৈ হয়ে আছে।অকেবল ক্যামেরার য়াঙ্গল আর ফ্রেমটুকুর অপেক্ষা।

দেখি সামনের আয়পার্টমেন্টের সাজানো গোজানো ঘরে ঢুকে পড়েছে এক চিলতে আকাশ আর এক ফালি মেঘে ঢাকা সূরয়।

দেখি আমার অগোছালো ল্যাব চলে গেছে আকাশে ছড়ানো মেঘেদের কাছাকাছি। ১৩৭৩৫ টুইনব্রুক পার্কওয়ের বাড়ির আর নেই ঠিকানা!ল্যাব করিডর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দেখি লালে লেখা exit আমাকে নিয়ে শূন্যে পাড়ি দিয়েছে, সেই বাড়ির পথে।
~~~

ক্যামেরার ফ্রেমে, জানলার ফ্রেম পেতে ক্যাচ ধরে ফেলি দশটা সূর্যোদয়।

দেখি ওদিকের ঐ সুখী ছিমছাম বাড়িটা খাপে খাপে জোড়া ইঁট জুড়ে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে এপাশের ন্যাড়া মেপল গাছের ছায়ারা।

বরফ সাদা স্ক্রীনে হেঁটে চলে যায় ছায়াছবিরা।

একটু আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির জমে থাকা জলে ঝুঁকে পড়া ধোয়া মোছা আকাশটাকে আর অম্লি ঝকঝকে তকতকে লাগে না। কালো পিচরাস্তার বুকে ভাঙ্গা আয়নায় তার মুখ বিষণ্ন লাগে, তিরতিরে হাওয়ায় সে মুখ কেবলি ভাঙ্গে। কেবলি ভাঙ্গা মুখের জন্ম হয়।

আর কোন আডজাস্টমেন্ট নয়, প্রসেসিং নয়, আমি শুধু ফ্রেমিংটুকু করি।

আর এমনি বৃষ্টি হলে, এমনি জল জমলে, আমার যেমনটি ইচ্ছে শহরটা তেমনটিই হয়ে যায় যে!

এমনি বৃষ্টির দিনে গল্পরা কবিতা হয়ে যায়, মনে পড়ারা মন কেমন, ইতিহাসেরা রূপকথা আর তাই ফোটোগুলো হয়ে যায় আঁকা ছবি।

বৃষ্টি হলে সব সত্যিগুলো আমি দেখতে পাই। এই যেমন, আমার বরাবরের সন্দ ছিল এই কালো পীচঢালা রাস্তাটার ঠিক নীচেই একটা শহর আছে। রাস্তা আছে। আলো আছে। যে শহরে সব উল্ট হয়। উলটে থাকে। বৃষ্টি হলে সেই শহরটাকে খুঁজে পেয়ে যাই।

দেখি, সেই শহরের রাস্তায় নিটোল যুবতী চাঁদ টালমাটাল।

আর দেখি, রাস্তার লাল নীল সবুজ আলোগুলো সব ধুয়ে যাচ্ছে। একটার সাথে আরেকটা মিশে যাচ্ছে। আর কিছু ডিস্ক্রিট নেই। মিশে যাচ্ছে, মীড়ের টানে।

দেখি, সেই শহরের রাস্তায় নিটোল যুবতী চাঁদের শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে ছড়ানো।

ম্যাজিক। ম্যাজিক কি?

কোন শাটার স্পিড,আপারচারের আডজাস্টোমেন্ট আর করতে হয় না। ফ্রেমটুকুন করি মাত্র।

দেখি, আমার সাঁঝবাতির হ্যালোজেন রূপকথা ছেড়ে বেরিয়ে এসে বৃষ্টিতে রং লিখছে। আমাকে পাঠাচ্ছে।

পড়তে পড়তে আমার মন ভালো হয়ে যায়। এই শহরে। প্রথমবারের মত।

যদিও এ ঠিক আমার শহর নয়।

এমনি ই ছিলাম। মন্দ না। ক্যামেরা দিয়ে দেখতে দেখতে। দেখতে মন্দ না।

মন্দ লাগছিল সেদিন বিকেলবেলা। ক হপ্তা আগের বিকেল। দোলের আগের বিকেল।

এ শহরে কোন দোল ছিলনা। এ শহরে কোন রঙ ছিলনা। এ শহরে তখনও রাতভরে বরফ। এ শহরে তখনও বসন্ত দূর অস্ত।

একটু অবাক হয়েই দেখলাম, আমার বিষাদবিলাসী মন এই সত্যিকারের দু:খে তেমন সুখী হল না। মন কেমন করছিল। আমার শহরের জন্য।

~~~

মন খারাপ করছিল। সত্যিকারের।

আর তখনি দেখলাম।

অপূর্ব সেই আলো।অশেষ বিকেলের। আর ঝকঝকে তকতকে আকাশে রঙের সে কি খেলা!

কী ব্রাইটনেস। কী কনট্রাস্ট। কী ভরপুর স্যাচুরেশন।অটোনের কী ভ্যারিয়েশন। হ্যু এর কী রেঞ্জ।

লাল গোলাপী কমলা হলুদ, নীল আবীরে যত শেড হয়, স-অ-ব। স্পেক্ট্রার স-অ-ব ফিকোয়েন্সি ছুঁয়ে গেছে। স-অ-ব।

বসন্ত আসুক না আসুক, বসন্তোতসব এসেছে।

এই প্রথমবার চেয়ে দেখলাম। ক্যামেরা ছাড়া।

এই প্রথমবার ভাল লাগল। ক্যামেরা ছাড়া।

এই প্রথমবার আমার শহরকে খুঁজে পেলাম।

ম্যাজিক কার্পেটে চার সাগর পেরিয়ে আমার শহর এখানে ল্যাণ্ড করলো।

নেমে এলো। সন্ধে নামার এই একটু আগে। পুব দিকে নয়,পশ্চিমেতেই।

আমার এই পশ্চিম খোলা জানলায়।

ম্যাজিক! ম্যাজিক! ম্যাজিক!

তিন সত্তি।
~~~

রক্তমাংস ও একটি মানুষের উৎসব

শিবাংশু

১২ মার্চ ২০১৯

হোরি খেলত নন্দলাল, বিরজমেঁ। ব্রজভূমিতে হোরি খেলতে গেলে কানু ছাড়া গীত নাই। ইতিহাস বলছে কানুই অনার্যদের আদি নেতা। বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ে কখনও জিতেছিলেন, কখনও বা পারেননি ভারতভূমির এই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিত্বটি। ইনি পুরাণবর্ণিত দ্বারকার ন'ন, মথুরার ন'ন, ন'ন মহাভারতের গীতাকথক। ব্রাহ্মণদের ছাঁচে ফেলা 'ভদ্রলোক' সভ্যতার যেসব উৎসব অনুষ্ঠান, তার সমান্তরালে নিম্নবর্গীয়দের প্রাণের উদযাপন, যার আবশ্যিক অঙ্গ বন্ধহীন শৃঙ্গাররসে উত্তাল, আসব নিমজ্জিত হোলিকা দহন ও প্রমত্ত ব্যসন, তাকে আশ্রয় দিতে কানু ছাড়া আর কেই বা আছেন। অতএব ব্রজভূমির পশুপালক সমাজ, যাঁরা এ মাটির আদত সন্তান, বসন্তের ব্যাকানালিয়ায় প্রকৃতির সঙ্গে যখন একাত্ম হয়ে ওঠেন, কানু তখন তাঁদের স্বাভাবিক অবলম্বন হয়ে ওঠেন। মুক্তির, ভক্তির, শক্তির দেবতা। তাই ব্রজভূমির নন্দলালকে বন্দনা করেই এদেশের বসন্ত উৎসব, হোলি।বাঙালির দোলযাত্রা। ইস মেঁ বুরা ক্যা?

হোলির বাজারে একটাই স্লোগান। বুরা না মানো, হোলি হ্যাঁয়। হাজার বছর আগে রাজারা বছরের এই একটা দিন ভাঁড়েদের অনুমতি দিতেন তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করার জন্য। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলেছে। তা কেউ না মানলেও বিহারিদের জন্মগত ভাঁড়ামির অধিকারে হোলির দিন " সা রা রা রা রা" র জলে এসব শৌখিন মজদুরিকে রঙের বালতিতে চুবিয়ে দেওয়ার গপ্পো শেষ হওয়ার নয়।

বহুদিন হলো। খ্রিস্টিয় পঞ্জিকা শুরু হবার সমসময়। এদেশের আদি সামাজিক উৎসব ছিলো ফসল কাটার পর উদ্দাম বসন্ত উদযাপন। মানুষ তাদের গৃহ ও পরিবেশ সংস্কার করতো। সামাজিকভাবে সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতো সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। প্রত্যেকে নিজেদের বাসস্থান ধুয়ে-মুছে, তৈললেপন করে সুগন্ধি লতাগুল্মের ধূপদীপ দিয়ে সজ্জিত করতো তাকে। মাঘ-ফাল্গুন মাস জোড়া এই উদযাপনের মুখ্য অংশ ছিলো নির্বাধ ভোগসুখের পরম্পরা। এই উৎসবটি আসলে প্রাচীন প্রজননমুখী লোকবিশ্বাসের অঙ্গ। শৃঙ্গারকেন্দ্রিক খেলাধুলো, নৃত্যগীত ও ভাঁড়ামির প্রমত্ত আয়োজন। পুরুষ ও নারী, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরকে নানাভাবে রঙিন রঞ্জক দিয়ে আবৃত করতো। এই সময় এবিষয়ে কোনও রকম সামাজিক বিধিনিষেধ নিয়ে লোকে মাথা ঘামাতো না। সন্ধ্যা নামলে মানুষ ফুলসাজানো রথ আর জ্বলন্ত মশাল নিয়ে পুর বা গ্রামপরিক্রমা করতো। প্রথামাফিক এই সময় উদ্দাম নৃত্যগীতের সঙ্গে পরস্পরের প্রতি ফুল, তণ্ডুল ও সুগন্ধি নিক্ষেপ করার সঙ্গে ঢোলক, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ বাজিয়ে উদযাপন করাই ছিলো বসন্ত-উৎসবের মুখ্য আকর্ষণ।

এই অনুষ্ঠানের পর রাজা নিজে হলকর্ষণ করতেন। ঘৃতসিক্ত বীজ রোপন করে কৃষিকাজশুরু করা হতো। এর ঠিক পক্ষকাল পরেই ছিলো মদন আরাধনা বা কামমহোৎসব।

'প্রদ্যোতস্য সুতা বসন্তসময়স্তংচেতি নাম্রা ধৃতি

কামঃ কামমুপৈত্বয়ং মম পুনর্মনৈ মহানুৎসবঃ।।'

(শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকে কামউৎসবে রাজার উক্তিঃ সপ্তম শতক)

'প্রদ্যোতের কন্যা (রতি দেবী), বসন্তসময় এবং তুমি বিদ্যমান। অতএব নাম দ্বারাই কাম পর্যাপ্ত সন্তোষ লাভ করুন। এই মহান উৎসবকে (বসন্তকালীন কামমহোৎসবকে) নিজস্ব উৎসব মনে করছি। '

জীমূতবাহন লিখেছিলেন দায়ভাগ গ্রন্থ দ্বাদশ শতকে। তা'তে রয়েছে হোলাক বা হোলক উৎসবের কথা। সারা উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশেও এই উৎসবটির সম্যক প্রচলন ছিলো। সময়ের সঙ্গে এই পার্বণটির ক্রমবিবর্তন বেশ আকর্ষণীয় বিষয়। আদিযুগে এই উৎসবটি ছিলো কৃষিসমাজের পূজা অনুষ্ঠান। শস্যপূর্ণা চ বসুন্ধরার কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাসম্পৃক্ত নৃত্যগীত উদযাপন ছিলো এর মুখ্য অঙ্গ। এই অনার্য ঐতিহ্যের সঙ্গে পরবর্তীকালের বৈদিক উপচার হোমযজ্ঞ মিলে যায়, নরবলির বদলে পশুবলি প্রচলিত হয়। সুশস্যকামনায় পূজা অর্চনার ক্ষেত্রে যেমন বলি ও যজ্ঞ গৃহীত হয়, একইভাবে হোলির শৃঙ্গাররসমুখর দিকটি কেন্দ্র করে বসন্ত, মদন ও কাম উৎসবের এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাখেলার উৎপত্তি হলো। এর সঙ্গে কোন এক মূর্খ রাজাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার জন-ইচ্ছাটিও প্রথা হিসেবে সামগ্রিকভাবে হোলি উৎসবের অংশ হয়ে গেলো।

যেরকম নথিভুক্ত ইতিহাসে দেখা যায়, তৃতীয়-চতুর্থ শতকে, অর্থাৎ গুপ্তযুগের প্রাথমিক সময়কাল থেকেই ষোড়শ শতক পর্যন্ত সম্পূর্ণ পুরাণযুগে বসন্ত বা মদন বা কামমহোৎসব নামে একটি উৎসব উত্তরভারতের সর্বত্র অতিসমারোহে পালিত হতো। এই উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাৎসায়নের কামসূত্রে, সপ্তম শতকে শ্রীহর্ষের রত্নাবলীতে, অষ্টম শতকের মালতী-মাধব নাটকে, একাদশ শতকে অল-বিরুনির লেখায়, দ্বাদশ শতকে জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থে এবং ষোড়শ শতকে রঘুনন্দনের বিবরণে। এই উৎসবে প্রচুর নৃত্যগীতবাদ্য, শৃঙ্গারসূচক সংলাপ ও যৌনতাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি মুখ্য স্থান নিয়ে থাকতো। পূজা অনুষ্ঠানের অভীষ্ট দেবতা ছিলেন মদন ও রতি দেবী এবং পুষ্পময় চৈত্রের অশোকবৃক্ষের ছায়ায় তার আয়োজন করা হতো। সপ্তম শতকে রচিত শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকে মদন মহোৎসবে ভিজ্যুয়ালটি এইভাবের বর্ণনা করা হচ্ছে,

'অহো, পৌরগণের আহ্লাদ অত্যন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, যেহেতু দিবস প্রারম্ভতুল্যকারী কুঙ্কুমচূর্ণবদ গৌর, বিক্ষিপ্ত পীত চূর্ণরাশি ও স্বর্ণালংকরণ দীপ্তি এবং কিঙ্কিরাত পুষ্পশোভিত ভার অবনত পীত পরিচ্ছদশোভিত কৌশাম্বী নগর যেন স্বর্ণদ্রব মন্ডিত লোকযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে'। (অর্থ, পীত বস্ত্রশোভিত পুরবাসীরা পীতচূর্ণরাশি (আবির) প্রক্ষেপ করে অশোকবৃক্ষের ছায়ায় স্বর্ণমন্ডিত হয়ে কামউৎসব উদযাপন করছে।)

ব্যাপারটি অবশ্য পুরোপুরি এদেশী নয়। য়ুরোপে এর প্রচলন দীর্ঘকাল ধরেই ছিলো। রোমান পঞ্জিকায় পয়লা মার্চ ছিলো বর্ষারম্ভ। মার্চ মাস মঙ্গলগ্রহের দেবতার নামে। যিনি পৌরুষের দেবতাও ছিলেন। এইদিনটি থেকে পুরোহিতরা একপক্ষকাল পথে পথে নেচে গেয়ে উল্লাস উদযাপন করতেন। ১৬ই ও ১৭ই মার্চ ছিলো ব্যাকাস নামে যে দেবতাটি গ্রিক ডায়োনিসাসের প্রতিরূপ, তাঁর পর্ব। সারা রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে উদ্দাম পানভোজনের উৎসব হিসেবে পালন করা হতো সেটি। নিম্নবর্গীয়, অ-রোমান মানুষদের এই ব্যাপক উদযাপন দেখে রোমক অভিজাত শ্রেণীর সিনেট এই উৎসবটির উপর নানা বাধানিষেধ আরোপ করে। যদিও জুলিয়স সিজরের আদেশে এই উৎসবটির উপর রোমক সিনেটের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় যিশুর জন্মের বেশ আগেই।

পুরোহিতদের এই নৃত্যগীতকে মহাজাগতিক শক্তির প্রতি আহ্বান মনে করা হতো। পরবর্তীকালে প্রায় সমগ্র খ্রিস্টিয় বিশ্বে যে কার্নাভল (Carnaval) শোভাযাত্রা দেখা যায়, তার উৎস প্রাচীন পুরোহিতদের নৃত্যসংকীর্তন। এর মূল রয়েছে সুমেরিয়দের পৃথিবীমাতা ও প্রজননমুখী লোকধারার (Fertility Cult) উত্তরাধিকার।

প্রাচ্যের এইসব লৌকিক উদযাপন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়শতক থেকেই প্রচলিত ছিলো। প্রকৃতিবাদী 'ধর্ম'বিশ্বাসের নানা অঙ্গ রোমান সভ্যতার আগে থেকেই প্রভাবিত করেছিলো য়ুরোপিয় লোকযাপনকে। আদি খ্রিস্টিয় লোকাচারের মধ্যে ব্যাকাসের নামে প্রকৃতিবাদী উৎসব ভালোভাবেই জায়গা করে নিয়েছিলো। কিন্তু কালক্রমে ক্যাথোলিক বিশ্বাসের প্রভাবে তা ক্ষীণ হয়ে যায়।

রোমান সিনেটের পুরুষ সদস্যরা এর বিরোধিতা করলেও তাঁদের অন্তঃপুরিকারা প্রকৃতিবাদী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। ব্যাকাস বা ডায়োনিসাসের নামে যে বাধাবন্ধহীন উৎসব পালন করা হতো তার মূল চালিকাশক্তি ছিলেন রোমান অভিজাত মহিলারা। মার্চমাসের ১৬ই ও ১৭ই তাঁরা রোমের অ্যাভেন্তাইন পাহাড়ে সিমিলিয়া কুঞ্জে প্রাচীন গ্রিকদের অনুসরণে জাঁকজমক সহকারে এই উৎসব উদযাপন করতেন। ক্ষমতাশালী নারীপুরোহিতদের নেতৃত্বে এই উৎসব সমাজের বিভিন্ন স্তরে বেশ আধিপত্য বিস্তার করে। বসন্তঋতুকালীন শৃঙ্গার উৎসব পালন সারা পৃথিবীতেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিলো। যদিও এই উৎসবটিকে ঘিরে ক্ষমতাশালী ও নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যে ক্ষমতার রাজনীতির টানাপোড়েন কখনও স্তিমিত হয়নি।

যেরকম অনুমান করা হয়, এদেশে ষোড়শ শতকের পরবর্তীকালে চৈত্রীয় কামমহোৎসব, ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় প্রচলিত হোলি উৎসবের সঙ্গে মিলে যায় এবং পৃথকভাবে মদন উৎসব উদযাপনের দিন শেষ হয়ে যায়। আসলে মুসলিম রাজাদের আমলে হোলি উৎসব রাজ অনুগ্রহে প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং মদন উৎসবকে গ্রাস করে নেয়। তবে এর ধর্মীয় দিকটি বেঁচে থাকে যখন একাদশ শতক নাগাদ রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব এই চৈত্রীয় পার্বনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। অল-বিরুনির বিবরণ ছাড়াও গরুড় ও পদ্মপুরাণে এমত পড়া যায়। তারও পরবর্তীকালে এই অনুষ্ঠান চৈত্র পূর্ণিমা থেকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এগিয়ে আসে। এই উৎসবের প্রধান পালনীয় কৃত্য ছিলো ঝুলন আরোহী রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি সখিসহচরীরা আবীর, কুমকুম ও পুষ্পবৃষ্টি করবে। বাংলায় এই জন্যই উৎসবটিকে 'দোলযাত্রা' বলা হয়, ঝুলনে দোলায়িত পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্মসম্মিলনের দৈবী মাহাত্ম্য মুখর এর গরিমা। প্রাক বৈদিক আদিম কৃষিজীবী সমাজের ব্যাকানালিয়ার উদযাপন ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে হোলির বর্তমান রূপে বিবর্তিত হয়েছে। এখনও এই উৎসব মূলত 'শূদ্রে'র উৎসব। হোলিকাদহন বা বাংলায় যার নাম চাঁচর, তার আগুন অস্পৃশ্য শূদ্রদের থেকে গ্রহণ করার বিধি রয়েছে।

উত্তরভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো বঙ্গদেশেও দোলপূণিমার দিন বসন্ত উৎসব পালন করা হতো।বস্তুত এদেশে এই উৎসবটির আর্যসংস্কৃতিমুখিন রূপরেখাকে অতিক্রম করে আর্যেতর উদ্দাম উদযাপন অনেক বেশি প্রকট হতে দেখা যেতো। কারণ এটি মূলত কৃষিজাত সমাজের উৎসব। 'নিম্নবর্গীয়'দের প্রাণের উদযাপন। পুরাণযুগের পর সুলতানি আমলে এই উৎসবের সঙ্গে কামদেবতার পরিবর্তে কৃষ্ণরাধার আধ্যাত্মিক সংযোগটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে আর্যাবর্তের হোলি এবং বাংলার বসন্ত-উৎসব তার নবতর সংস্করণ 'দোলযাত্রা' নামে বৈষ্ণবমত বিশ্বাসীদের প্রধান উদযাপন হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীচৈতন্য ছিলেন এই পরিবর্তনটির পথিকৃৎ। মূল বসন্ত বা কামমহোৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোত শৃঙ্গারমুখী নগরভ্রমণ বৈষ্ণব অধ্যাত্মপ্রথায় নগরসংকীর্তনে বদলে যায়। বৌদ্ধ সহজযান থেকে উদ্ভূত বাংলা সহজিয়া লোকধর্মের বিভিন্ন শাখার অনুগামীদের কাছে দোলযাত্রা

ক্রমে অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। নবাবি আমল শেষ হবার পর বৈষ্ণবদের দোলযাত্রা উদযাপন বড়ো মাপের সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। সমাচার দর্পণে (৯ই মার্চ, ১৮২২) দেখতে পাই, "মোকাম শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিশ ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।"

কয়েকবছর পরে এই সংবাদপত্রেরই ২৮শে মার্চ, ১৮৪০ সালে বঙ্গদেশে এই উৎসব পালনের একটি অন্য রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়।

"হুলির উৎসব।-বর্ত্তমান কালীন হুলির উৎসবে নানা দাঙ্গাহঙ্গামা ঘটিয়াছে বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়েরা ঐ উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল। পরে তাহারা অত্যন্ত মদ্য পানে মত্ততা পূর্ব্বক আবির দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ হইয়া এবং নানা কুৎসিত গান করত পথে২ বেড়াইতে ছিল ইতি মধ্যে কাবল হইতে আগত কএক জন মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।...." (বানান অপরিবর্তিত)। 'শিক' জাতীয় বলতে মনে হয় শুধু শিখধর্মীয়দের নয়, সামগ্রিকভাবে উত্তর ভারতীয়দের কথাই বলা হয়েছে। বস্তুত প্রায় দুশো বছর আগের এই বর্ণনা আজকের উত্তরভারতের হোলি উদযাপনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বাঙালির 'দোলযাত্রা'র থেকে এর বিপুল ফারাক।

উত্তর ভারতে প্রচলিত হোলি উৎসবের যে সাধিত অমার্জিত উদযাপন রয়েছে তার থেকে ঊনবিংশ শতকের বাবুকালচারভিত্তিক নাগরিক বাঙালির 'দোলযাত্রা'র চোরাস্রোত আর অবক্ষয়ের ডাইনামিক্সের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিলোনা। এই পর্যায় থেকে দোলউৎসব উদযাপনে ব্রাহ্ম রুচিবোধ ও য়ুরোপিয় সফিস্টিকেশন নিয়ে আসার কৃত্যটি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেকালের বাঙালির থেকে একালের বাঙালির রুচি ও মননবোধে আরো অসংখ্য পরিমার্জন সাধনের পথে কবির এই প্রয়াসটিও অল্পবিস্তর সফল হয়েছিলো। তবে শান্তিনিকেতনী দোলের পৌত্তলিকতা, কালিদাসের কুমারসম্ভব বা বিহার অওধের শারীরমাংসে তপ্ত "রং বরসে" জুনুন, সবই পরস্পর পৃথক নিগূঢ় রণিত সন্ধান। দিনের শেষে উৎস খুঁজতে গেলে হোলি একান্তভাবে মানুষের উৎসব। দৈবী মহিমা আরোপ করে তার প্রতি অবিচার করার কোনও হেতু নেই।

আমাদের কবি যেমন বলেছেন, সহজসুন্দর,

.....সেইখানে তার পরাণখানি, যখন পারি বহে আনি,

নিলাজ রাঙা ফাগুন রঙে রাঙিয়ে দিতে থরে থরে।।

ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগলঝোরা লুকিয়ে ঝরে ....

(সৌজন্যঃ ইরাবতী)

আজ আমাদের নেড়াপোড়া

তাতিন বিশ্বাস

১৯ মার্চ ২০১১

ঈশ্বরের অনুজ্ঞা তাই। দুষ্কৃতীর বিনাশ ভিন্ন ধর্ম প্রতীত হন না। ধর্ম নইলে ধেনু দুগ্ধবতী হয় না, গোধূম স্বয়ং পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। ধর্মমতে মানবমোক্ষ অর্থের ফেটিশে, কামনায়, যজ্ঞের উৎপাদনে ও শত্রুর নিধনে। মানুষের ইতিহাসজুড়ে সমস্ত শ্রুতিই তাই সন্তান কামনায়, ফসল ও রাজ্যের বিস্তারে, শিল্পায়নে উদ্দিষ্ট। ধর্মের বিরোধীদের তাই পুড়িয়ে মারাই নিয়ম। ধর্মযুদ্ধের পর ইনকুইজিশন হয় চার্বাকপুত্রদের। যাঁরা বিজয়োল্লাস ম্লান করে দিতে ভরা রাজসভায় প্রশ্ন তোলেন, অক্ষৌহিণী হত্যায় তুমি কী পেলে রাজন? অন্ধনগরীর যুধিষ্ঠির অথরিটিকে প্রশ্ন করতে গিয়ে ব্রাহ্মণরোষে পুড়ে যান তাঁরা। কারণ, তস্কর পাষণ্ড ও বৌদ্ধনাস্তিক সমরূপে দন্ডনীয়। ইতিহাসের কর্মযজ্ঞের অনবারিত ধারাকে প্রশ্ন করে ফেলেন এঁরা। কমোডিটি-ফেটিশের অর্থবহ জীবন ছেড়ে দিয়ে বেছে নিতে বলেন ভিক্ষুর জীবন। প্রচার করে যান-- ঈশ্বর যদি থাকেন, মোক্ষ যদি থাকে, কর্মচক্র নির্ধারিত জন্মে তা নেই, জন্ম নির্ধারিত কর্মফলেও নয়। রয়েছে জীবনে, বৈরাগ্যে, অনাত্মায়, অনীহায়। আর অক্ষৌহিণী সেজে যাঁরা লড়বে, শবর সেজে যাঁরা মহারাজের শিকারের বরাহ রমণের নারী যোগাবে, কৃষিক্ষেত্র যাঁরা তুলে দেবে ইন্দ্রপ্রস্থের মালিকের হাতে; সেই সব জাতশূদ্রের দল, দলেদলে যোগ দিতে থাকে ধর্মবিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধের লোকায়ত আহ্বানে। প্রত্যাখ্যান করে শ্রুতির অর্থ-বাহক জীবন। সঙ্ঘ গড়ে ভিক্ষে করতে থাকে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র বৌদ্ধ আপ্যায়নে অর্থদণ্ডের বিধান দেন আর মনু বলেন বৌদ্ধস্পর্শে শততীর্থ স্নানের প্রাচিত্তির। পুরাণ খুঁজে পায় দৈত্যবিরোধের ইতিহাসস্মৃতি, তথাগত নির্মিত হন পুরাণে দৈত্য গয়াসুর নামে বিষ্ণুর পদপীড়িত, ইতিহাসমতেই তো দৈত্যকন্যা হোলিকাকে পুড়িয়ে মারার বিধান। জ্বালানো হতে থাকে বুড়ির ঘর, বৌদ্ধের আবাস। উত্তরে কাশ্মীররাজ নর, মধ্যে পুষ্যমিত্র, পূর্বে শশাঙ্ক সম্ভবিত হন দৈত্যসংহারক হিসেবে। দক্ষিণে পেরিয়ার প্রতিদিন ৬০০০ করে জৈন আহুতি দিতে থাকেন রাজসূয় যজ্ঞে। আরও উত্তরে গান্ধারে দনুজদলন করেন সূর্যাধিকারী হুনরাজ মিহিরকুল। রাজ পরাক্রম ছড়িয়ে যায় তুরস্ক থেকে আসা সৈন্যবাহিনীতেও। এপারের ব্রাহ্মণের পাশে দাঁড়ায় সভ্যতার ভিনদেশি ক্ষত্রিয়। সহস্রাধিক বছরের নালন্দা হয়ে ওঠে আরেক বুড়ির ঘর।..... শতাব্দীর পর শতাব্দী ঐতিহ্য বহন করে চলে মাও এর তিব্বত, তালিবানের বামিয়ান আর জামাতের রাঙামাটি। বাংলাদেশে ঘোষিত হয় বাউল ফকির ধ্বংস ফতোয়া, নেড়া-নেড়ির দহনযজ্ঞের সাক্ষী হতে থাকে ফাল্গুনের পূর্ণিমা চাঁদ আর তারা-র পীঠে, পুরীর বিশাল বৌদ্ধস্তূপে বেদমন্ত্রে পূজোপচার চলতে থাকে।

সভ্যতা এভাবেই ভাবে- ক্রিয়া করে, অর্থের শাস্ত্রই ধর্ম তার। বিনিময়ের অতীত যা যা, তাকে অতীত করে দিয়ে নিয়ে আসে শিল্পবিপ্লব, কলোনি-বানানোর লড়াই, ইনকুইজিশনের নেড়াপোড়া। তবু সেই যজ্ঞের কালি আবির হয়ে গুঁড়োগুঁড়ো মিশে যায় সব চেয়েছির রাজত্বে। বেদবিরোধী শূন্য উপাসক বৌদ্ধ নাগার্জুনের মায়ায় ধর্মসংস্থাপক শঙ্কর ধর্মকেই মায়া ভেবে বসেন। স্তূপের আদল রেখে শিবলিঙ্গ পুঁতে যান মানুষের বাড়িতে বাড়িতে, অবধারিত করে যান খাদ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ব্রতয় ব্রহ্মচর্য, কর্মে আত্মনির্যাতন। নেড়া বৌদ্ধের মতই শিখা কেটে ফেলেন ব্রাহ্মণ বিশ্বম্ভর মিশ্র। উপবীত ছিঁড়ে ফেলে ভূলুণ্ঠিত হন মোক্ষের উপাস্যে। ভারতের প্রান্তে

প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে বেদ-বিমুখ জাতবিহীনদের হোলিখেলা। সম্বলে বাঁদরের রঙ, ভাঙের সিদ্ধিদ্রব্য। ক্রমশ: মন্দির বহির্ভূত:, যজ্ঞরহিত উচ্ছ্বাসের সামাজিক সংশ্লেষ তৈরি হতে থাকে আশূদ্র ভারতসমাজে। হোলিকা নিধনের ফাগোৎসবের দিন ইতিহাস মুখ ঘুরিয়ে দেয় লালন সাঁইজির সাধুসঙ্গের উৎসবে, একব্রহ্মের উপাসক রবিঠাকুরের বসন্ত উৎসবে। শূদ্রভারত তো এভাবেই ব্রাহ্মণ্য উৎপাদনতন্ত্রের অত্যাচারের সমস্ত দাগ গায়ে রেখেও, কান্না-অবিচারের ঊর্ধ্বে উঠে যেতে শেখে আনন্দের উপাসনায়।

দোল দোল দুলুনি

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

২০ মার্চ ২০১১

আগের দিন

এবার গুরুর দেড়শো বছর বলে কিনা কে জানে, শান্তিনিকেতন পুরো ছোটো সে তরী। দোলের আগের দিন থেকেই। হোটেল ওয়ালারা তিনগুণ ও রিক্সাওয়ালারা মোটামুটি চারগুণ দাম হাঁকছে। তাতে এক্কেবারে না দমে গিয়ে বিয়ের শাড়ি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরা কলকাত্তাইয়া বাবু ও বিবিরা বেরিয়েছেন সাঁঝের ঝোঁকে তীর্থ দর্শনে। রিক্সাওয়ালা বলছে "ঐ দেখুন এটা হল উপাসনা গৃহ, স্বয়ং রবিঠাকুর এখানে উপাসনা করতেন'। শুনে গিন্নি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে পেন্নাম ঠুকছেন, আর কত্তাকে চোখ পাকিয়ে বলছেন "তুমিও নমো করো'। চতুর্দিকে লোক থিকথিক করছে। শ্যামবাটির সাঁকোর মোড়ে তেড়ে ট্র্যাফিক জ্যাম। সরু-মোটা-লম্বা-বেঁটে নানাবিধ গাড়ির লাইন। এদিকে সোনাঝুরি, ওদিকে গোয়ালপাড়া আর কবিগুরুর খাস এলাকায়, মনে হয় এক্কেবারে বোলপুর স্টেশন অব্দি। ট্রাফিক ক®¾ট্রাল করতে রীতিমতো পুলিশ বসেছে। তাতে অবশ্য উপকার কিছু হচ্ছে তা নয়। সব গাড়িই কলকাতার। ট্রাফিক পুলিশকে চুক্কি দিতে সবাইই প্রচন্ড দড়। বেঙ্গল পুলিশকে তাঁরা থোড়াই কেয়ার করেন। পুলিশের আনকোরা ছোকরারা ঘেমে-নেয়ে একশা আর গাড়ি বাবুরা একে অপরকে টেক্কা দিতে গিয়ে নিজেরাই চুপচাপ বসে আছেন। একটু-আধটু যদিবা ফাঁক-ফোকর পাওয়া যেত, সেটাও বুজিয়ে দিচ্ছে রিক্সা আর ভ্যানো। এর মধ্যে ঘোঁট আরও খোলতাই করতে কলকাতা থেকে এসে পড়েছে ফ্রেশ ট্রেন, অতএব আরও একপাল রিক্সা। লোকে চিল্লাচ্ছে, গাড়ি হর্ন দিচ্ছে, রিক্সা কারো গায়ে উঠে পড়ছে, সাইকেলে সাইকেলে ঠোকাঠুকি হয়ে মারামারি হবার উপক্রম হচ্ছে, কিন্তু কেউ এক পাও এগোচ্ছেনা। ভাবসাব দেখে শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তনী মুজতবা আলির কথা মনে মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সে ভদ্রলোক খাইবার পাসের জ্যাম দেখে ভেবেছিলেন কী না কী দেখে ফেলেছেন। খোদ নিজের ঠেকেই যে কালে কালে সেই জিনিস দেখা যাবে, জানতে পারলে ভদ্রলোক ভারি খুশি হতেন। "দেশে-বিদেশে' টা হয়তো অন্যভাবে লিখতেন।

এর মানে অবশ্য এই নয়, যে, জ্যামের চোটে উৎসব থমকে আছে। এক্কেবারেই না। প্যান্ডেল খাটিয়ে দিব্বি গান-বাজনা শুরু হয়ে গেছে প্রাঙ্গণে। এখানেই পরের দিন বসন্ততোৎসবের সূচনা হবে। সেখানেও প্রকান্ড ভিড়। লোকে চা খাচ্ছে, চপ খাচ্ছে, মোবাইলে গপ্পো করছে, টুনিদিকে দশ বছর পরে হঠাৎ আবিষ্কার করে মুন্নিমাসী বিহ্বল হয়ে পড়ছেন, শান্তনুর এত্তো বড়ো ছেলে হয়ে গেছে দেখে পুরোনো বান্ধবী "ওম্মা ক্কী ক্কান্ড' বলে আহ্লাদের কুলকিনারা পাচ্ছেন না। ঘোষক মাঝে-মাঝে পলাশ ফুলের মালা পরতে বারণ করে যাচ্ছেন। পরিবেশের কারণে ("ফুল ছিঁড়বেন না, কিনবেন না')। শিল্পীরাও, একই লাইন চারবার করে গাইছেন, এটাই হয়তো শেষবার, কে জানে। তাই শুনেই কেউ কেউ গানের সঙ্গে মাথা নাড়াচ্ছে, বাকিরা বেতালা তাল দিচ্ছে। শিশুরা এই ভিড়ভাট্টায় কনফিউজড হয়ে কেসটা কি বোঝার চেষ্টা করছে। বাপ-মা তাকে রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছেন।

ভিড়ের চোটে কখন বৈতালিক হয়ে গেল টের পাওয়া গেলনা। ওদিকে ফাঁকা মাঠে উঠেছে ইয়াব্বড়ো চাঁদ। প্রেমিক-প্রেমিকারা চুপচাপ তাকিয়ে আছে সেদিকে। আহারে, বাইশ বছর বয়সটা কি ভালো।

দোলের এ বেলা

রবীন্দ্রসঙ্গীত তথা বাংলা গানের উপর পাঞ্জাবী ভাংরার প্রভাব ক্রমশ বেড়ে চলেছে, এটা এবারের দোলেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ওটাই এবার ইন থিং। কলাভবনের সামনে টিভি ক্যামেরা আসতেই ছাত্রছাত্রীরা ফিউশন রবীন্দ্রগান ধরলেন। ব্যাপারটা লিখে বোঝানো কঠিন। লিখলে অনেকটা এরকম হবে: "আজি দখিনদুয়ার খোলা আ আ হৈ হৈ হৈ হৈ পর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌ '। একই স্টাইলের আধুনিক গানও শোনা গেল পরে। সেটা এরকম: "আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে হৈ হৈ হৈ হৈ পর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌'। বাকি গানবাজনা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড। মহীনের ঘোড়াগুলির প্রকোপ কিঞ্চিৎ কমেছে দেখা গেল। "সাধের লাউ ' আর "লালপাহাড়ির দেশে যা'র সঙ্গে নৃত্য বছর দশেক আগেও দেখা যেত, এখনও যাচ্ছে। তবে দেড়শো বছর বলে কিনা জানা নেই, ভিড়ের সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির বিস্তার দেখা গেল কলাভবনের প্রাঙ্গন ছেড়ে বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি সেই আম্রকুঞ্জ আর ছাতিমতলা পর্যন্ত। আম্রকুঞ্জে জনৈক হারমোনিয়াম ধারী গায়ক বেশ চাঁছাছোলা গলায় ভালোবাসা সংক্রান্ত বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় গান গাইছেন, ভিড় ভালই। অন্যদিকে লালপাড় শাড়ি পরে হাতে স্বরলিপি নিয়ে মাঠে বসে মহিলারা সমস্বরে কোরাস গাইছেন "ভারত আমার ভারতবর্ষ'। চারদিকে একটাও লোক নেই, নির্ঘাত রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেবেছে।

রং খেলা নিয়ে অবশ্য বিশেষ সারপ্রাইজ নেই। ধুলোয় ধুলোক্কার। ফাগে দুনিয়া অন্ধকার। বেপাড়ার ছেলেপুলেরা হাতে আবীর নিয়ে ঘুরছে, যদি কোনো চান্স মেলে। উঠতি গায়করা মাঠে গান গেয়েই চলেছেন। টিভি চ্যানেলের স্টারকে নাগালে পেয়ে মেয়েরা পুরো লাল-নীল ভূত বানিয়ে দিচ্ছে। শহুরে তরুণী এই হ্যাংলামি দেখে "যত্তো সব গাঁইয়া' বলে ঠোঁট বেঁকাচ্ছে। বুদ্ধিজীবীরা তেড়ে ছবি তুলছেন। এর তার সঙ্গে খেজুর করছেন। জলের বোতলে স্লাইট মধু ভরে গলা ভেজানো জারি। মায়ের শাড়ি পরে গিন্নিবান্নি হয়ে ঘুরছে সাত বছরের পুঁটিরানি। গাড়ির আয়নায় নিজের মুখে নিজের আবীরের দাগ লাগিয়ে প্রসাধন সেরে নিচ্ছে কিশোরী। লাল আবীর মাখা তরুণের সামনে ঠোঁট ফুলিয়ে বসে নীল রঙ মাখা অভিমানাহতা তরুণী। তুমি আমাকে রঙ দিলেনা, অন্যেরা এই গাল ছুঁয়ে দিল? এই মান ভাঙবে কী করে কে জানে? সকালে অন্য কোথাও যাবার থাকলে আগেই এটা সেরে নিলেই ঝামেলা চুকে যেত। সাধে কি আর কবি লিখেছেন:

লাল কমলের আগে নীল কমলি জাগে

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো তুমি যাবার আগে।

দোলের ও বেলা

বিকেলের আকর্ষণ হাট। সোনাঝুরি টপকে। গেঁয়ো মেঠো নয়, এক্কেবারে নিশ সেগমেন্টের জন্য। সোনাঝুরি এমনিতেই হেব্বি ফেমাস জায়গা। শান্তিনিকেতনের অর্ধেক জিনিসের নাম সোনাঝুরির নামে। যথা: সোনাঝুরি বিল্ডার্স, সোনাঝুরি স্টেশনার্স প্রভৃতি। অনেকে অবশ্য "সোনাঝুড়ি'ও লেখেন। তাতে "সোনার ঝুড়ি' টাইপের একটা ফিলিং আসে, মনে হয়। জায়গাটির দাম তো অবশ্যই আছে। এই দিকেই তো কদিন আগে রিয়েলিটি শো'র শুটিং হয়ে গেল। বললে হবেনা। এমনিতে হাট শনিবার শনিবার বসে। প্রবল ভিড় হয়। আজ আবার দোল স্পেশাল। ধুলোয় ধুলোয় গোধুলিবেলা অন্ধকার। পদরেণুতে সূর্য ঢেকে যায়-যায়। শালবন ঢেকে যাচ্ছে

প্লাস্টিক কাপে। সে অবশ্য হবেই। উৎসব মানেই তো আবর্জনা। অর্থনীতি বাড়বে। কেনাকাটা হবে। কিন্তু আবর্জনা ফেলার একটিও জায়গা তৈরি হবেনা।

এদিক-সেদিক নানা খুচরো উৎসব শুরু হয়ে গেছে। প্রাঙ্গণে আজ "চিত্রাঙ্গদা' হবে। লিফলেট বিলি হচ্ছে। মাইক টাঙিয়ে গোয়ালপাড়ার কি যেন অনুষ্ঠান হচ্ছে। গেস্ট হাউসের ছাদে বক্স লাগিয়ে চলছে হৈ হৈ নৃত্য। ওদিকে খোয়াইয়ের পাড়ে পূর্ণিমা চাঁদ উঠেছে। সেখানেও অবশ্য সারা রাত লোক থাকবে। হৈহল্লা হবে। অন্তত আজকের রাতে।

আগামীকালের কথা অবশ্য আলাদা। কালও চাঁদ উঠবে। কিন্তু শহুরে বাবুরা আর থাকবেন না। সংকীর্ণ রাস্তার ধারে প্লাস্টিক কাপ, ভাঁড়ের স্তূপ, সিগারেটের ফেলে দেওয়া প্যাকেটের জঞ্জাল, মিনারেল ওয়াটারের বোতল টিকে থাকবে উৎসব আর উন্নয়নের অভিজ্ঞান হয়ে। সারি সারি বাড়ি থাকবে অবিকল, মানুষ থাকবেনা। জমি থাকবে, জমির দাম বাড়বে, যেমন বাড়ছে। শহরের পয়সায় তৈরি হবে সুরম্য সব অট্টালিকা। উৎসবের দিনে সেসব ভরে যাবে অতিথিতে। বাকি দিনগুলোয় ঘর অন্ধকার করে থাকবে দেড় হাজারি কেয়ারটেকার। আর চাঁদের আলোয় জেগে থাকবে একটি মৃত নগরী। জ্যোৎস্নারাতে বনে নয়, সবাই চলে যাবে কলকাতায়, আর এই আধাখেঁচড়া হাফ-শহরটি প্রতীক্ষা করবে পরবর্তী উৎসবের।

দোল ইন্টারন্যাশনাল

সৃজন সমাদ্দার

২২ মার্চ ২০১১

সব খেলার একটা নিয়ম আছে। নিয়ম না বলে, স্বত:সিদ্ধ বলা ভালো। অঙ্কের খেলায়, তুমি গোলকে চৌকো করতে পার না। ফুটবল এ নিজের দলের গোল তাক করে লাথি ছুঁড়েছ কি মরেছ। তেমনি একই লিঙ্গের মানুষের সাথে দোল খেলার কোনো অর্থ হয় না। কম সে কম দুটো চাই। লিঙ্গ, অর্থে gender। অথচ অনেকেই সে নিয়মের তোয়াক্কা না করে যৌবন অতিক্রম করেন। তখন অনুশোচনার মত অনুভূতি হয়।

আমি হোস্টেলে ঢুকেছিলাম, পাশেই ladies হোস্টেল বলে। মেয়েরা থাকবে, ভালো করে দোল খেলাটা শিখব। যুক্তির ফ্লো টা সঠিক হলেও, আমার (আর আমার সহপাঠীদের) ক্ষেত্রে প্রথম শর্তটা অপূর্ণ থেকে গেল।

তাই আমরা আধাখ্যঁ¡চড়া খেলি। আগের রাত্তিরে মেসের বাসন পিটিয়ে হোস্টেল আর পুকুর চক্কর মারি। সাধারণ খেউড় হয়। ভাং-এর ট্যাবলেট যোগাড়, আর মদ খাওয়া। সকালে উঠে প্রফেসর quarter থেকে প্রণামের অজুহাতে মিষ্টি সংগ্রহ। তারপর বালতি বালতি রং এর-ওর ওপর ঢালা। ঘুমন্তদের ঘরে দরজার নিচ থেকে রং দেওয়া। দশটার দিকে ভাং সরবতের প্রস্তুতি দেখে আসা। মদ খাওয়া। ফুটবল। আবার ভাং। এর-ওর জামা ছেঁড়া। showerএর নিচে জোম্বি বন্ধুদের নেংটা তুলে আনা। এনে মদ খাওয়া। সন্ধ্যের দিকে হোলি night এর নাচ আর নাটক। রাতে সামান্য একটু মদ।

ম্যাদামারা। পানসে। অর্থহীন দোল।

অন্য কলেজ থেকে এর-ওর বন্ধুদের কাছে রোমহর্ষক গল্প শুনতাম। তখন আমরা পূর্ব ইউরোপের পাবলিক, আর ওরা লোহার পর্দা টপকে আসা, পশ্চিমী আত্মীয়।

যাদের বাড়িতে দোল খেলা হয় না, তাদের অন্তত গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম চলে। বড়রা ছোট ও সমবয়সীদের গালে সস্নেহে আবির মাখিয়ে দেন। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির মা, জেঠিরা খোল দ্বার খোল গাইতে গাইতে মিষ্টি বানান। আমাদের বাড়িতে কোনো কিছুই হত না। আমার ঠাকুরদা ঠাকুরমাকে দোল পূর্ণিমার দিন বিয়ে করেছিলেন। সেবারই শেষ খেলা। হিন্দিতে বললে, খেল খতম। ওই দিনটাকে উদযাপন করার সাহস আর কারো হয় নি। মেজ জ্যাঠা এক যুগ আগে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই কিছু লাল আবির আনা হয়েছিল, কিন্তু পরে ফেলে দেয়া হয়। আমাদের বঞ্চিত করার পেছনে ছিলেন মূলত: একজন।

বন্দী কাকা। (জেলে জন্মেছিলেন, তাই ঠাকুরদার এই নামকরণ) যার ছেলে ফুচিক (ডাকনাম ফুচকে), যাকে নিয়ে গল্প।

'৯১ এর কালীপুজোতে ফুচিক তুবড়িতে হাত পুড়িয়েছিল। পরের বছর বন্দীকাকা ঘোষণা করলেন আমরা সপরিবারে ম্যাজিক দেখতে যাব। শঙ্কিত সমবেত প্রশ্ন "কত টাকার বাজি?'

"ধুর ও তো বাচ্চারা খেলে, আমাদের বাড়ির ছেলে হয়ে শেষে চরকি ঘোরাবি?'

"না তো কি ছোকরি ঘোরাবো?' বাড়ির বড় ছেলে বাপ্পার মুখ বরাবরই আলগা।

কাকিমা যুক্তি দেখালেন। 'বাড়ির ছেলে বলে কি বাচ্চা নয়?'

"মিখাইল মলোতভ এর জীবনী পড়েছ? পড়লে জানবে উনি কোনদিন চকোলেট বোমা ফাটাননি। একবার ভাব তো শিশু চে রং মশাল জ্বালিয়ে হাসি হাসি করছে? সূর্য সেন দোদমা ফাটিয়ে বন্ধুদের কাছে ঘ্যাম নিচ্ছেন এসব ছেলেখেলা করলে আগ্নেয়াস্ত্রর কনসেপ্টটাই গুলিয়ে যাবে। আসল সময়ে বালান্স করতে পারবে না। '

৯৩ দোলের দিনটাও এইভাবে চটকে গেল। আগের বছর দীপদের বাড়িতে আমার চোখে সামান্য রং ঢুকে গেছিল। পরেরবার সিঁড়ির মুখে আমাদের দেখে বন্দী কাকা আকাশ থেকে পড়লেন।

"এসব কী?'

"রং, আবির..'

"এখনো? এই বয়সে?'

"কেন, কী হয়েছে?'

"তোদের বয়সে ক্ষুদিরামও হোলি খেলেছিলেন। এম এন রায়ও। কিন্তু একটু ইতিহাস ঘাটলেই জানবি সেগুলো ছিল রক্তের হোলি।' সে সময় আমি অনেক ইতিহাসের বই পড়তাম। তাই একমাত্র আমিই বুঝলাম কাকার কথার মানে। যে সব দেশে হোলির তেমন চল নেই, সে সব দেশের লোকও, যেমন অ্যাটিলা, নেপলিয়ন, হোলির এই ব্র্যান্ডটা খেলতেন। শোলে তে দেখেছি গব্বর সিংহ পাহাড়ের গা চাবকিয়ে হোলি কবে জিগেস করছেন। সে হোলি আবির আর বাঁদুরে রংএর নয়।

এই বলে কাকা আমাদের হয় কোনো রক্তদান শিবির, নয় আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস এর নাটক বা exhibition এ নিয়ে যেতেন। সব জায়গাতেই লাল রং কোনো না কোনভাবে ছিটকে বেরুত।

আমি অবশ্য বাইরে বেরোতাম পাড়ার মাতাল দেখার জন্য। আর অন্য কোনদিন দেখতে পেতাম না। আমার বাড়িতে কস্মিনকালে কাউকে মদ খেতে দেখিনি। দাদু সুনীল-শক্তির যুগে কবি হয়েও খেতেন না। (আত্মীয়দের মতে, এটা ওনার জীবনের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রথমটা হলো আনন্দবাজারে না লেখা) টিভিতে যদিও দেখেছি উত্তম কুমার মদ খাচ্ছেন। রাজেশ খান্না দোলের দিন মদ খেয়ে আকাশে উড়ছেন, নিচে রেখা। শুধু দোলের দিনই মাতালরা কেন দৃশ্য হয়, এটা সেই আমলে একটা ভাববার মত প্রশ্ন ছিল। আমি বাংলা রচনায় এদের কথা লিখতাম। আমি জানতাম মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা একমাত্র গির্জার ঘন্টা আর এদের স্খলিত পদক্ষেপেই ভাঙে। তবুও অনেক জানা বাকি ছিল।

মধুবাবুর বাজার পেরিয়ে ৩ নম্বর পুলের নিচে দীপদের চাকর অনিল টলতে টলতে এক পা এগোত আর দু পা পেছোত। চেক শার্টটা গনেশ পাইনের প্যালেট। কাকা দেখিয়ে বলতেন "পিটি দিস ম্যান। হি হেস নো ক®¾ট্রাল ওভার হিমসেলফ।' ফুচকে কী অর্থ করত জানি না, আমি কাকাকেই করুণা করতাম। আর আশা রাখতাম, সামনে থেকে না হলেও, একদিন ওপর থেকে রেখাকে দেখব।

বন্দী কাকার কথা এলো ফুচকের বড় হওয়া কিছুটা বোঝাতে। ৯৪-এ আমরা পদ্মপুকুর ও তারপর কলকাতা ছেড়ে যাবার পর আর ওদের সাথে তেমন যোগাযোগ রইল না। দশ বছর পরে ফুচকে যখন আমাদের কলেজেই ভর্ত্তি হল, তখন কাকা সাথে এসেছিলেন হোস্টেলের রুম দেখতে। তার আগেও একবার এসেছিলেন, পরীক্ষার ফর্ম, question ইত্যাদি যোগাড়ে।

ঘটনাক্রমে সেদিন ছিল দোল। এক নতুন ছোঁড়া মদ এর ঘোরে কাকাকে আবির দিয়ে প্রণাম করতে গেলে কাকা হাঁ হাঁ করে ওঠেন। কিছু ছেলে জড়ো হল। শ্রোতা পেয়ে বন্দী সমাদ্দার একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। "আমরা কিন্তু ভাই দোল খেলেছি রক্ত দিয়ে, কিছু মনে কোরো না। আমার দাদাও তাই। এই, ধর তোমাদের বয়সী বা একটু ছোটই হব। একইসাথে দীপাবলী আর দোল। পাইপগান থেকে আগুন ঝরছে, আর

গা থেকে গরম ফ্রেশ blood। এই এখানেই। এই হোস্টেল এর কাছেপিঠেই এককালে কত রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে। তোমরা কি এসব জান?'

হোস্টেলে আসার পর ফুচিকের কোনো ragging হল না।

দেড় সেমেস্টারের মধ্যে ফুচিকের একটা ব্যথা মত জন্মায়। প্রথমেই লিখেছি হোস্টেল ছিল, কিন্তু মেয়েরা থাকত না। আশা রাখব পাঠক পাঠিকারা এটার ৯৫ শতাংশ ইন্টার্ভাল করে নেবেন। মানে, কোর্সে ভর্ত্তি হওয়া মোট মেয়ের সংখ্যা ১২, তাদের মধ্যে ৮ জন বছরে দিন দশেকের বেশি থাকত না। যারা থাকত, আমরা তাদের homework করে দিতাম। তবে এই গল্পে সেইসব মেয়েদের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। বাড়িতে আন্তর্জাতিক শুনে বড় হওয়া ফুচিকের কাছে এরা এমনিতেও matter করত না। প্রথম হোস্টেলের মানুষরা যখন দ্বিতীয় হোস্টেলের মানুষীদের assignment করতে ব্যস্ত, ফুচিকের নজর পড়েছিল campus এর (বড় পুকুরের দক্ষিনে, গেস্টহাউসের ধার ঘেঁষে অবস্থিত ও দুটো বড় তালগাছ দ্বারা আংশিক আচ্ছাদিত) তৃতীয় হস্টেলটির দিকে।

যেখানে ছেলে মেয়েরা থাকত একসঙ্গে। চমকে হাততালি দেবার কিছু নেই, এরা কেউই ভারতীয় নন . কিছু একটা বদখত degree নিতে ওদের দেশের সরকার stipend দিয়ে দু বছরের জন্য এখানে পাঠায়।

আফ্রিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকেই বেশির ভাগ। আমাদের সুমিত মন্ডল ওদের হোস্টেলে মাঝে মাঝে tution পড়াতে যেত। ওখানকার দু একটা ছেলে আমাদের club এর হয়ে খেলেওছে। তবে মেয়েদের নাম ছাড়া বিশেষ কিছুই জানতাম না। মন্ডল বলত। মমু, ভাভা, জেভম। হ্যাঁ¡, ফুচিকের ব্যথার নাম ছিল ইয়ুন তাং।

হোলি nightএর এক মাস আগে ছাদে নিয়মমাফিক জিবি মিটিং ডাকা হল। নাটকের বিষয় ঠিক করতে। ফুচিক হাত তুলে ঘোষণা করলো এবারের হোলি হবে রক্তের হোলি। আমরা উৎসুক হলাম। নাটকের ভালই নাম। জমাটি হবে। সুদেশ পান্ডে বলল "আগে' --হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিব রাঙিয়া --- "Let's play this holi with blood'

ব্যাপারটা অনুধাবন করতে দু মিনিট গেল। আগের বারের বাওয়ালের পর থেকে শশাঙ্কবাবু আর দীপঙ্করদা উপস্থিত থাকতেন। দু ' মিনিট পর শশাঙ্কবাবু ব্যাপরটা আন্দাজ করে মুখ খুললেন; "আহা মেয়েদের সাথে দোল খেলবে খেলোই না, কে মানা করেছে? এসব রক্ত ফক্ত আবার কেন?'

ওনার বোঝার পর দীপঙ্করদা বুঝলেন।

"ওহ এই ব্যাপার। মেয়েদের সাথে দোল খেলবে? তা বললেই হয়। যাও permission দিলাম। হা হা। সব কলেজেই তো হয়, এটা কোনো ব্যাপার নাকি, তোমাদের সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। হা হা হা'

ফুচকে গর্জে উঠলো।

"কীরকম? আপনি জানেন ওই সব কলেজে কী হয়? কী expect করলেন, আমরাও তাই? রং বার্সে চালিয়ে লারেলাপ্পা করি? "do me a favour lets play holi?' লোমশ ঠ্যাং দেখিয়ে ১৯-২০ বছরের হুমদো ছেলে বেতালে নাচছে, মেয়েদের এখানে সেখানে জড়িয়ে ধরছে। এদের মধ্যে চালু মালরা আবির নিয়ে strategically হিট এন্ড রান এর ধান্ধায়। প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে অবোধ মেয়েদের ধর্ষণ করি, বলছেন?'

second year রা বলল "আমরা কিন্তু রক্ত দিতে পারব না, মদ গাঁজা ভাং অনেক ধাক্কা, শরীরটা weak থাকবে।'

নানা কোণ থেকে নানা কথা, বিতর্ক গজিয়ে উঠল। "সমাদ্দার, how perverted can you get man?'

"co-ed school এ না পড়লে এরমই হবে। এসব sample ১৮ বছরের frustration এর ফসল।' মোটামুটি ঠিক হল যা করার ফুচিক একাই করবে।

আমার লজ্জার থেকে বেশি কষ্ট হচ্ছিল। ফুচিকের মত bright ছেলে পদ্মপুকুরের বাড়িতে থেকে এরকম বিকারগ্রস্ত হয়ে যাবে ভাবিনি। আমি ফিসফিস করে কিছু বলার চেষ্টা করলাম "ফুচকে জানি তুই এসব ব্যাপরে অভিজ্ঞ, তবু বলছি, এটা post y2k। এইসব সাইকো তশফরন আজকাল মেয়েরা খায় না। তুই তো ভালো আবৃত্তি করতিস,...'

ফুচিক অনড় দেখে সিনিয়ররা technical দিকে চলে গেলেন। পিচকিরি হলে point blank range ছাড়া উপায় নেই। ভিসকোসিটির একটা ব্যাপার আছে, after all blood is thicker than water। এইসব।

ফুচিক weekendএ আর বাড়ি ফেরে না। শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে হোস্টেল এর পশ্চিম wing থেকে একটা সুদীর্ঘ কালো ছায়া ঘনাতে থাকে। পাঁচ দিনের বাবলি গ্রাস করার মতলব তার। আমরা পড়ে থাকি। গাণিতিক মনে আধিভৌতিক ছোঁয়া আসে। এই সব সময়ে একা একা তিনতলার পুব wing-এ না যাওয়াই ভালো। কারণ সেখানে একটা পূর্ণ -ভৌতিক ফতুয়া আর সবুজ halfpant পরা ফুচিক পায়চারি করবে।

তার মাথায় নানান নতুন তথ্য যেগুলো সে বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। সে তথ্যগুলো আমন্ত্রণ -এ সুমিত মন্ডলের থেকে ডিম ভুজিয়া খেতে খেতে নেয়া।

"য়িযুন এর বয়স কত?' "য়িযুনের প্রিয় রং কী? "য়িযুনের প্রিয় লেখক কে? '

"য়িযুনের দেশ কী?'

"কী?'

ফুচকের চোখ প্রথমে ছোট হয়ে যায়, তারপর জ্বলজ্বল করে ওঠে।

"vietnam!!!'

কেশর খাঁর caseটা আমাকে আজকাল খুব ভাবায়। রবি ঠাকুর এনার কথা কবিতায় লিখেছিলেন। লোকটা রাজপুত রানীর ইনভি পেয়ে বাড় খেয়ে গেছিল। পরে কে এল পি ডি হয়ে যায়। ফুচকে কিছুই পায়নি। তবু সে তার কচি গোঁফে তা দেয় কোন সুখে?

দোলের দিন দখিন থেকে কোনো হাওয়া না আসলেও, আমরা ব্যাকুল মনে মাতাল হয়ে এলাম। ফুটবল খেললাম। তারপর বল ঘিরে জড়ো হয়ে বসলাম। ভাঙের প্রভাবে ভঙ্গুর পৃথিবী। fractured আত্মার নির্দেশে সামনের গোলটাকে বিশ্বের আদি বিন্দু ভেবে নেওয়াই যায়। এর মধ্যে ফুচিকের খবর কে রাখে? যার হৃদয়, তার রক্ত। রাগ হলে সেই দেখবে।

complaint এলো সন্ধ্যেবেলা। দীপঙ্করদা জানালেন। molestation। সোমবার office এ জানানো হবে। ডিনারের পর আমি আর মন্ডল ক্ষমা চাইতে গেলাম। আমি, মন্ডল, মমু, ভাভা সবার ইংরেজি জ্ঞানে একটা অপূর্ব সাম্য থাকার কারণে আলোচনা খুব দ্র¦ত এগোলো। কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ জানা গেল না। ফুচিক হাত দিয়ে কপালে ঠেকিয়ে কিছু একটা বলেছিল। তারপর নিজেই blood blood বলে চেল্লালো। তারপর সকলে ওখান থেকে পালিয়ে আসে।

ভাভা বললেন "in india women no respect ever।'

মন্ডল মৃদু প্রতিবাদ করলো "That toh in village, not here Trouble of the fact is, that the guy is mad, too much reading make him mad'

-তিন চারজন সমস্বরে বলে উঠল "yes yes he looks like mad'

-আমি বললাম "you come from buddhist countries, you should forgive'

-এত গম্ভীর কথার মধ্যে য়িযুন এর গলা শোনা গেল না।

সেটা সোমবারে শুনেছিলাম, canteen এ। দুজন দুটো মিনি রসগোল্লা নিয়ে ঘন হয়ে বসে ছিল। ভিয়েতনামের য়িযুন তাং আর কলকাতার ফুচিক সমাদ্দার। দুজনের ভাঙা ইংরেজিকে কোনো অনুবাদই সঠিক মযা Ñদা দিতে পারে না, তবু চেষ্টা করে দেখা যাক।

য়িযুন; "ওটা সত্যি কি তোমার ছিল? '

ফুচিক, ইতস্তত করে; "হ্যঁ¡, কেন?'

য়িযুন; "পরে চেটে খেলাম তো। দারুন খেতে'। হাসি।

এ মেয়ে তো মেয়ে নয় vampire নিশ্চয়ী!

ফুচিক: "পৃথিবীর সব মেয়েই কি এক? তোমরা আসলে পুরুষের দেহ না, মন না, রক্ত ভালবাস'

য়িযুন, কিছু না বুঝেই; "হ্যাঁ¡ বাসি'।

আমি শনিবার রাতে মন দিয়ে বেহেড ফুচিকের হাত দেখেছিলাম। শুঁকেও ছিলাম। রক্তের আলাদা কোনো গন্ধ থাকে কিনা জানিনা। সত্যি বলতে, আমি তো খানিকটা ৪৫ টাকার macdowells এর ঝাঁঝ পেয়েছিলাম। কিছুটা মুন্‌শিদার রান্নার। গাঢ় লাল খাসির ঝোলের পরিচিত সুবাস। হয়ত ফুচিক গুলিয়ে ফেলেছিল। য়িযুন তাং পুরো ব্যাপারটাকে মশকরা ভেবেই নিচ্ছে, মনে হয়। আমি কোনো পক্ষেরই ভুল ভাঙাই নি। ফুচিককেও জিগেস করা হয়নি।

আসলে দোল লাগলে রক্তকেও আর শক্ত লাগে না। রক্ত। যা জল বা ঝোলের থেকে অনেক বেশি গাঢ়।

সরল দোল গতি

টিম

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০১০

দোল নিয়ে ক্রোড়পত্র। তো, মনে করে দেখলাম ক্লাস সেভেনের পরে বিভিন্ন কারণে দোল খেলা হয় নি আমার। (এক্ষেত্রে, দোল বলতে রংটং নিয়ে যে উৎসব তাকেই বোঝানো হচ্ছে, বলাই বাহুল্য)।

সুতরাং, সেইসব অল্পস্বল্প অভিজ্ঞতা, যাদের চৈত্রসেলে কখনও সখনও মেদুর বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তাদের আর নাই বা টেনে আনলাম। বরং দোলের অন্যবিধ ভূমিকা নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চালাচালি করা যেতে পারে। শেষপাতে চাটনির মত একটুখানি ভেজাল দিলেও দেওয়া যেতে পারে, মেন কোর্সে যা পাবেন, সব ভেজাল দোল। বা বলতে পারেন, অন্য দোল। এইযে ভূমিকাতেই প্যারাডাইম শিফটের মত একটা জিনিস গছানোর আপ্রাণ চেষ্টা, এই আকূলতাকেই সমাজতাত্ত্বিকেরা অন্য দোল বলে থাকেন। ক্রমশ প্রকাশ্য।

দোল অনেকরকম হয়। আপনি বাঙালি হলে একরকম, ভারতীয় হলে আরেকরকম। যদিও এইদুটো দোল, মানে কিনা একটা দোল আর একটা হোলি, আসলে দুটো-ই হোলি। একই ইয়ের এপিঠ-ওপিঠ আরকি। সেই দোলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর দেখাদেখি যাবৎ মেনস্ট্রিম নায়ক-নাইকা ইতিউতি পিচকিরি ছোঁড়েন, আবির ছড়ান। চারদিকে রং এর ছড়াছড়ি, জামাকাপড়ের ইতরবিশেষ করা যাচ্ছেনা, ক্যামেরা রং এর উৎসব কভার করতে এসে ক্রমাগত সফেদ পট্টবস্ত্রে আটকে যাচ্ছে (অবশ্য আপনার টিভি বা সিনেমার একটা যদি সাদাকালো যুগের হয় তো অন্য কথা। সেক্ষেত্রে কালো-ধূসর ইত্যাদি ঘোলে সন্তুষ্ট থাকতে হবে)--- এসব নিয়েই আধুনিক সিনেমার দোল। এর পরেই পরিচালকের রুচি, বাজেট, টার্গেট দর্শক ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে কখনও বা ধুন্ধুমার লড়াই হবে, কখনও বা মুখে ছোপছোপ রং মেখে (অ্যাজ ইফ যারা রং দিতে এসেছিলো তারা জানত ছদ্মবেশ দরকার) বজ্জাত ভিলেন নাইকাকে ধর্ষণের ব্যর্থ বা সফল চেষ্টা করবে। তারপর আবার নাচ-গান-কান্না ও মারামারি করে সমস্ত গোলমালের নিষ্পত্তি হবে।

এ তো গেল সিনেমার কথা। সিনেমার বাইরেও দোল হয় বইকি। সেই কবেই কবি বলেছেন ""লাগলো যে দোল''। দোল আন্তর্জাতিক হতে পারে। আজকাল বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে দোল খায়। এখন যেমন চিলিতে হচ্ছে। কদিন আগেই হাইতিতে দোল হলো। আগেকার দিনে, যখন কন্সপিরেসি থিওরির কথা লোকে জানতো না, তখন এইরকম দোল এলে মানুষ পুজোআচ্চা করে বাঁচার চেষ্টা করত। আজকাল সবাই জানে, দোল এলো মানেই প্রথম বিস্‌সো ছুঁচোবাজি ছেড়েছে। তা, একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে যারা সারাবছর কম্পিটিশন করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে, তারাই দোলের (বা ধরুন তজ্জনিত সুনামির) সময় মুক্তকচ্ছ হয়ে আর্ত উদ্ধারে ছুটে যান।

ক্ষেত্রবিশেষে দোল রাজনৈতিক হতে পারে। গেরিলা নায়ক বিপ্লবের প্যারালাল বারে দোল খেতে খেতে হঠাৎ উল্টোপথে চলতে পারেন। গতকাল অবধি কিসিপন্থী নেতা, আজ দোল খেয়ে সিল্পোবন্ধু হয়ে যেতে পারেন। দোলে অনেক কিছুই হতে পারে।

খেলাধুলোয় তো দোলের রাজত্ব। যেমন কিনা, ড্রিবলারের দোল। স্বর্গত অজয় বসু এই ধরণের দোলের উদাহরণে বলেছেন, ""অমুক শরীরের দোলায় তমুককে ছিটকে দিয়ে যুবভারতীর সবুজ মখমলের ওপর দিয়ে ...." ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়াও কবাডি, কুমীর-ডাঙা, বাস্কেটবল বা হকি সর্বত্রই দোল উপস্থিত। ক্রিকেটে অনেকদিন অবধি দোলের অনুপ্রবেশ প্রায় বন্ধ ছিলো। টিভি ক্যামেরা ছাড়া সে দোল কেউ দ্যাখেনি, যতই না কেন মেক্সিকান হোক সে ঢেউ। কিন্তু টি-টোয়েন্টি মারফৎ দোল এলো, দেখলো ও জয় করলো। এখন সমস্ত বিশ-কুড়ির মাঠে বাধ্যতামূলকভাবে চি:লি:রা দোল খ্যালেন।

খেলার কথাতেই শরীরের কথা এলো। শরীর আর দোল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হলি-বলি-টলিউড থেকে নাগেরবাজার, পোস্টাপিস থেকে বইমেলা যেখানেই যান, সর্বত্রই ""দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা''। গানেও দোল আছে। বিপ্লবীর বলিষ্ঠ কণ্ঠের সামান্য কান্নিক লাগা ""দোলা, হে দোলা, হে দোলা'' বলিউডি সংস্করণে হয়ে যাচ্ছে ""ডো-ও-লা রে''। জাতীয়তাবাদী নিন্দুকেরা বলে এসবই সায়েবদের উচ্চারণের সুবিধে করে দেওয়ার জন্য। আমরা অতশত বুঝিনা। তাছাড়া, দোল খেলতে নেমে রং দেখলে চলেনা।

শেষমেষ আসলি দোলে ফিরে আসি। আসলি লছমিবাবুকা আসলি সোনাচাঁদিকা দুকানের মত আর চিহ্নযুক্ত দোল। হ্যাঁ, যেকথা হচ্ছিলো। দোল এবং পানীয়। ছোট থেকেই দেখেশুনে আসছি, দোল এলেই লোকে জলপথে যাওয়া-আসা করে। ঠিক ঐদিনটাতেই কেন মাল খাওয়ার চল (বা ছল) বেশি সে নিয়ে ঐতিহাসিক হিসেবনিকেশ করার মত পুঁথিপত্র কাছে নেই। আমাদের পাড়ায় দোলের পরদিন একদল হিন্দীভাষী বিপুল উদ্যমে খোল বাজিয়ে দুর্বোধ্য সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সেইসাথে চলতো পান। মানে পহলে পান ফির গান এইরকম একটা জটিল প্রক্রিয়ায় ব্যাপারটা শুরু হয়ে যখন চেনসিস্টেমে দুপুর অবধি গড়াতো ততক্ষণে সঙ্গীতের গতি বর্ষার কূলপ্লাবী নদীর মত অবাধ হয়েছে। অত:পর গায়ক ও নর্তকেরা নিজেদের মধ্যে খামচা-খামচি করে জামা ছিঁড়ে রাস্তায় নেমে আসতেন। প্রায় প্রায় ঐ সময়েই রাবিন্দ্রিক (ঠিক ঐ দিনটায় ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পড়ে এরা দোল খেলতে বেরোতেন) ও বিপ্লবী দোলখেলুড়েরা (এঁরা পরতেন খাদি বা গাঢ় রং এর পাঞ্জাবী ও জিনস) বাড়ি ফিরতেন। এরপর যা হত তা অবিশ্বাস্য। চিন্তা ও কাজে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটো দল (একমাত্র মিল নেশায় দুদলই টাল্লি খেয়ে আছে), একদল হিন্দীতে ও আরেকদল বাংলায় নাচগান করতে করতে ইন্টার‍্যাক্ট করতো। আলোর ইন্টারফিয়ারেন্সের মত এ-বছর মারামারি হলে পরের বছর কোলাকুলি, এইরকম নিয়মে ব্যাপারটা হওয়ায় পাড়ায় এই নিয়ে কোন টেনশন হয়নি। বরং দোলের অস্থির সময় মাতব্বরেরা হালকা মনে সুদৃশ্য পানপাত্র নিয়ে সন্ধের মুখে বসতেন, কপালে এক আধজনের টিপছাপ থাকতো আবিরের। দামী সিগারেট, বেঁটে-মোটা গেলাস আর অ্যাশট্রেতে বুড়ির ঘর পুড়ছে --- এর থেকে চিত্তসুখকর দৃশ্য আর কিই বা হতে পারে? এছাড়াও দোল এলেই সবাইকে চাট্টি নেশা করে আছে বলে মনে হত। হয়ত সেটা আবহাওয়ার গুণ। হয়ত সেটা মানসিক ধুমকি, রাক্ষুসী হোলিকার নাগাল

এড়িয়ে পেল্লাদ পগাড় পার হওয়ার উল্লাস। সে যাই হোক, দোল ও মানুষের পানপ্রবণতা এমনই অমোঘ যে খোদ মার্কিনমুলুকে পজ্জন্ত ফলের রসের বোতলে বড়ো বড়ো করে ডি ও এল ই লেখা শুরু হয়েছে।

বিদ্বজনেরা বলেন (সবচে আগে যথাবিহিত আরেন্টিস্যারও বলে গেছেন), সবকিছুই বিদেশীদের থেকে শেখো। এই সুবাদে বিদেশের দোল (যা কিনা হোলি) নিয়ে দুকলম লেখা যাক। বিদেশের ভারতীয় কমিউনিটিগুলোর বাকিসমস্ত ব্যাপারের মতই দোলেও স্কেলিং ফ্যাক্টর আছে। ধরুন কলকাতার কোন অঞ্চলে আপনি দোল খেলতে বেরোলেন, আপনার সাথে জনা দশেক বন্ধু, আর বিপরীতে অগণিত জনতা। পরিচিত-অপরিচিত সকলেই আপনাকে এসে এক পোঁচ করে রাঙিয়ে দেবে, মায় প্রতিবেশীর পাঁচ বছুরে শিশু পর্যন্ত, হয়ত তার সেবছরই দোলে হাতেখড়ি হয়েছে। অন্যদিকে বিদেশের মাটিতে পুরো স্যাম্পল স্পেসটাই হয়ত দশজনের। এই বৃত্তের বাইরে আরো দশজন লাইভ দেখছে, তারও বাইরে আরো লাখখানেক লোক ইউটিউবে আপলোডেড ভিডিও দেখছে আর ভাবছে, অহো:! কি দু:সহ স্পর্ধা! দশজন পরস্পরকে রং দেওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করছে, প্রায় হাতেপায়েধরে ""রাঙিয়ে দিয়ে যাও'' কেস, কিন্তু রং দেওয়ার লোক নেই। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচারে এইসমস্ত ভিডিও সিডি ব্যবহার করা উচিত।

শেষে একটু কাব্যি করে নেওয়া যাক। গুরুপাকের পর হজ্‌মি, আর ভাটের পর কাব্যিসেবন করলে শরীর-মন দুইই ভাল থাকে। কবিরা দোল বা বাদল (আধুনিক বানান) নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। সবার রচনা নিয়ে আলোচনার জায়গা নেই। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কবিদের গুরু, অতএব গুরুদেবের কবিতা নিয়ে কয়েকটা কথা বললেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। রবীন্দ্রনাথ একটা আঠেরো পাতার কবিতা লিখেছিলেন। সেখানে দোল বা বসন্তোৎসব নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা আছে। তারই কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি;

".....

অপরাহ্নে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।''

কবিতাটা মূলত দোল নিয়েই। আবিরে পথ ধূলিচ্ছন্ন, ইতস্তত হাওয়া দিচ্ছে, বসন্ত আর ফাল্গুনের উল্লেখ আর শেষে প্রণামের কথা মানেই দোল। আরো একটু এগোলে এই ধারণা মজবুত হবে:

""কল্লোলমুখর দিন

কহিল গভীর রাত্রে সংসার বিরাগী

কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে

কান্নাহাসির-দোল-লাগানো পৌষ-ফাগুনের পালা''

বা

""দোলে রে প্রলয়দোলে অকূল সমুদ্র-কোলে''

এইসমস্ত পংক্তি ক্রমশই দোলের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করবে। কবিতায় আরো আছে;

""প্রেমের আনন্দ থাকে

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে

ফাল্গুনের র ঙিন আবেশ

ফুরাইলে দিবসের পালা

.....

বসন্ত পাঠায় দূত''

(প্রথম ছত্রের সূচী, সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এরপরেও কেউ দোল নিয়ে ইয়ার্কি করলে নিজ দায়িত্বে করবেন।

আজ বিরজ মে হোরি রে রসিয়া...

অভিজিত মজুমদার

০১ মার্চ ২০১৮

আজ বিরজ মে হোরি রে রসিয়া...

বৃন্দাবনের পথে পথে আজ রঙের উৎসব। গত এক মাস যাবৎ পলাশ, অপরাজিতা, গোলাপ ইত্যাদি পুষ্পপত্র শুষ্ক ও চূর্ণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে লাল, গোলাপি, সবুজ ও নীল গুলাল। আর সব কিছুর ওপরে রয়েছে বৃন্দাবনের নয়নমণি পীতাম্বরের প্রিয় হলুদ। হরিদ্রাচূর্ণর ভেষজগুনের জন্যই অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নন্দলাল একে হোরিখেলায় প্রাধান্য দিয়েছেন। চতুরচূড়ামণি জানেন অনুরোধ-উপরোধ-পরামর্শ-তিরস্কারে যে কার্য সিদ্ধি করা যায় না, তাকে রীতি-লৌকিকতায় মিশিয়ে দিলে সহজেই পালিত হয়।

এই সব আবীরের সঙ্গে মেশানো হয়েছে চন্দন আর কস্তুরী মৃগনাভী। আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তারই সুগন্ধ। চারিদিকে উঠেছে হাসি, গান, তালবাদ্যধ্বনি। অল্পবয়স্ক গোপবালারা মুঠো মুঠো আবীর ছুঁড়ে দিচ্ছে তাদের প্রিয় মানুষের দিকে। তাদের কাঁকণের শব্দ মিশে যাচ্ছে নূপুরের নিক্কণে। আবিরে তাদের গন্ডদেশ রক্তিম, মাধ্বীতে

চক্ষু মদির। গোপবালকেরাও পিচকারিতে ভরে ছুঁড়ে দিচ্ছে রঙীন জল। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার দিকে কঠোর নজর রাখছে নাগরিকের ছদ্মবেশে প্রহরীরা। কিন্তু এসবের মাঝখানে ব্রজপুরের প্রানভোমরা কৃষ্ণ কোথায়?

সবার অলক্ষ্যে এর থেকে অনেক দূরে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে কানু। সকালে আবীরে হাত ঠেকিয়ে ব্রজপুরে দোল উৎসবের সূচনা করে দিয়ে চুপি চুপি সরে এসেছে সে। মধুমঙ্গল, শ্রীদাম, সুদামারা এসে ডাকাডাকি করে ফিরে গেছে। কৃষ্ণ এদের সবাইকে আজ ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, "তোরা গিয়ে হোরি খেল। আমায় একটু একা বসে ভাবতে দে। শ্রীময়ী রাধা কুঞ্জবনে গতকাল যে প্রশ্ন করেছে, তার উত্তর না খুঁজে পাওয়া অব্দি আমার শান্তি নেই।" সন্দীপনপুত্র মধুমঙ্গলের কৌতূহল এদের মধ্যে সবথেকে বেশী। সে জানতে চাইল, "সে কি এমন প্রশ্ন যা ত্রিভুবনেশ্বরেরও অজ্ঞাত?" সুদামা ওকে নিরস্ত করে বলে, "তুমি বড় অহেতুক প্রশ্ন কর হে। বলার হলে কি কানহা আমাদের বলত না?"

কৃষ্ণ মৃদু হেসে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না, না সুদামা, তেমন কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্নও নয়। বরং বড় চিরন্তন প্রশ্ন। শ্রীমতী জানতে চেয়েছেন, প্রেমের সুখময় পরিণতি কিসে?"

শ্রীদাম এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, "এই প্রশ্নে কিসের চিন্তা সখা? প্রেমের সুখদ পরিণতি অবশ্যই মিলনে।"

কৃষ্ণ হাসলেন। তারপর বললেন, "সেই প্রশ্নই তো রাধা করেছেন। জানতে চেয়েছেন, যখন আমরা জানিই যে সে সুখদ পরিণতি আমাদের হবে না, তবে কেন এ কদিনের হোরিখেলা, ক্ষণিকের রাসলীলা? কেন জেনেশুনে কষ্ট পাওয়া?"

কৃষ্ণসখারা এই প্রশ্নে বিষণ্ন হলেন। এ সত্য তারাও জানেন তবু ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। তবে শ্রীরাধিকা কেন এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, তাও বসন্তোৎসবের একদিন আগে? সুদামা একটু রুষ্টকন্ঠেই বললেন, "লক্ষ্মীস্বরূপিণী কি তবে আজ কষ্টের ভয়ে ভীত হলেন?"

আবারও হাসলেন কৃষ্ণ। সুদামার হাত ধরে বললেন, "মুহূর্তের বিচলনে শক্তিরূপার শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করো না বন্ধু। তিনি এই প্রশ্ন যখন করেছেন, তার কিছু কারণ তো আছেই। তোমরা বরং হোরি খেলতে যাও। আমাদের কাউকে না দেখলে ব্রজবাসীরা চিন্তিত হয়ে পড়বে। আজকের দিনে তারা চিন্তান্বিত হন, সেটা কাম্য নয়। আমায়একটু একলা ভাবতে দাও।"

এই বলে চিন্তাহরণ তাঁর সখাকুলকে বিদায় দিয়ে আবার গভীর ভাবনায় মগ্ন হলেন।

****

এরপর বহুযুগ কেটে গেছে। একদিন এক শান্ত শীতল বিকেলে শিলং পাহাড়ে লাগল দুই গাড়ীতে ধাক্কা। নিজের নিজের গাড়ী থেকে নেমে এল এক তরুণ ও এক তরুণী। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল তারা। যুবকটি মৃদুস্বরে বলল, "আমার নাম অমিত রায়।" যুবতীটি বললে, "এ জন্মে এই নাম নিয়েছো বুঝি?"

যুবক অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর বলল, "আমারই ভুল। স্বয়ং মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে লুকোনোর চেষ্টা করাটা নিতান্তই বোকামি।"

যুবতী প্রশ্রয়ের সুরে বলল, "তুমি গোপন হবে আর আমি তোমায় প্রকাশ করব, এ তো আমাদের জন্মজন্মান্তরের খেলা। কিন্তু আমার সেই দ্বাপরের প্রশ্নের উত্তরটা যে এখনো পেলাম না বংশীধর? এইজন্মে তো তোমার সত্যভামা হবে কেটি মিত্র। তবে আমি কেন খেলব এই ক্ষণিকের হোরি তোমার সঙ্গে?"

যুবতীর প্রশ্নে চক্ষু বুজল যুবক। তারপর মন্দ্রকন্ঠে বলল,

"পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,

বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,

ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের

কূজনে দুজনে তৃপ্ত।

আমরা চকিত অভাবনীয়ের

ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।"

লাবণ্য চোখ নামাল। এই উত্তরই তো সে চেয়েছিল বংশীধারীর কাছে। বন্ধনহীন পথ চলার শপথ। কৃষ্ণের বামে গিয়ে তার কাঁধে মাথা রাখল ও। অস্তপ্রায় সূর্যের শেষ রশ্মি এসে রক্তিম আবীর মাখিয়ে দিল যুগলমূর্তির সর্বাঙ্গে। মৃদু হাওয়ায় তখন তাদের চারদিকে ঝরে পড়ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। না, লাল পলাশ নয়।

রডোডেনড্রন।

আঠাশ দুই - ২০১০

রমিত দে

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০

আমার

হাজার-লক্ষ-নিযুত-কোটি বছরের

আদরের সাঁঝ.....।।

ঘুম টেনে টেনে

টেনে টেনে

সব যাওয়া-সব ফিরে যাওয়া

আজ ঠিকানা লিখে উড়িয়ে দিলাম

ফিরে যাওয়া মেনে .....

লিখব কি লিখবো না? এইসব ভাবি। আজ অনেক বছর সরাতে সরাতে দু হাতে বুনেছি আমার স্তব্ধতা। ঘুমের সুরা। এ পথে এসো না। ধরে রেখো নিজেকে। চোখের আদর নামিয়ে আমার গ্রাম ডুবে আছে শতাব্দীর ঘুমে। কী ওড়াবো? ঘুম না ঘুম ভাঙাটা? আমি যে লড়তে শিখিনি সোনা; কিছুদূর যাবার পর মনে নেই কতদূর গেছি। ফিরে যাওয়াটা, শুধু ফিরে যাওয়াটা, ধানের কাঁকনে ফুটে থাকে ফেনার আয়তনে। চলে যাওয়ার শব্দ ঢেলে দিয়ে যায় ধোয়ানো আলো। নীরবতা আলো ফেলে দাঁড়ালে মাঝে মাঝে ভয় হয়; বুকের ভেতর জমা হতে থাকে ঘাসফুলের দ্বিধান্বিত বিকেল; নেমে আসি সাদা পাতায়; মাটির নির্মোক এ; কী বুনতে তুমি? বসন্ত-বসন্ত; ছুটে আসে পাথরে শোয়ানো হলুদ দুচোখ। কোমর অবধি পরাগ বুনতে তুমি; বেশ মনে আছে আমি হাঁটতে থাকি, হাঁটতে থাকি, হারিয়ে যাই বিগত ভ্রমণে; বুকপকেটে তুলে রাখা সেসব নষ্ট খেলা, তরল আগুন নীচু করলেই ফিরে আসে নিজস্ব শিকড়ে; কোথায় যেন দেখা হয়েছিল! কী যেন তার কথা! শতকের আলাপ টাঙানো ছিল চৌকাঠে-কার্নিশে-স্মৃতির আড়ালে; মাঝে মাঝে কলম নিয়ে বসে পড়ি, জবাব খুঁজি শতছিন্ন অন্ধকারের প্রতিটি বছর। ফিরে আসে ঋতু। প্রজন্মের কানামাছি। আমাদের জীবন কেটে যায় শতাব্দীর কুয়াশায় জোনাকি ছুঁড়ে দিয়ে। যেন বুঝতে চাইছি এসব অজানা ঋণের বোঝা; নেমে আসছি খোপে খোপে ভরাট শূণ্যতায়।

কতদিন পর এই রং? অতিথি এলো পলাশ-শিমূলে; তুমিও কি ঘুমিয়েছ? নয়নের চারাগাছগুলো ছোট ছোট পাড়ায় গড়িয়ে দিলেই ফালা ফালা লাল, প্রতিটা শিরায় ঢুকে পড়ে গোলাপী আঁচড়। বোতাম খুলে কুমারী হয়ে

ওঠে প্রথম চুম্বন। দোলসন্ধ্যার সাঁতার আওড়ে চলে সাহসী ঢেউয়ের সে দীর্ঘ গতকাল। সবুজের ভেতর আজ কোথা থেকে যেন এসে গেছে আমার ফুলছাপ ঘুম; তোমার স্বর্ণচাঁপা, তুমিও কি চিনেছো? এখনো ঘুমোয়নি যেন শরীরের হাঁটিহাঁটি, সেদিনের আলাপ - ঠিক পার হলো চাঁদিয়াল ঘুড়ির মতো দিকচিহ্নহীনতায়; এ দীর্ঘসময় - দীর্ঘসময় -ভেতরে যাইনি, নাকি ক্ষতের রাতগুলো ছুঁয়ে আছি আজও চোখের কালোয়।

" আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন

তারি গলার মালা হতে পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন

এল যখন সাড়াটি নাই, গেল চলে জানালো তাই

এমন করে আমারে হায় কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন

তখন তরুন ছিল অরুন আলো, পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ

বসন্ত যে রঙিন বেশে ধরায় সে দিন অবতীর্ণ

সে দিন খবর মিলল না যে, রইনু বসে ঘরের মাঝে

আজকে পথে বাহির হব বহি আমার জীবন জীর্ণ "

কয়েক মুহূর্ত থামলেই টের পাই অদ্ভুত জোড়া জোড়া শব্দ নেমে আসছে শরীরের প্রাগৈতিহাসিক দেওয়াল পেরিয়ে। প্রিয় হতে পারিনি তোমার কাছে কোনওদিনও, তবু এ সবই প্রিয় চিহ্ন, আলোর নিচে হারিয়ে যাওয়ার গল্প। আমি তো ঘুমিয়ে কাদা - কয়েক মুহূর্ত থামলেই পালতোলা প্রবাহ, সেই কবে, কবে-অর্ধেক ডুবে-পলাশ পলাশ সকালে কারা যেন পুঁতে গেছে আগুন ঠোঁটের রুমতাই। এসবই মুহূর্তকাল - এসবই আমার। শুধু প্রশাখা পেরিয়েছে পোশাকের অভ্যেসে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি চারিদিক দেখতে পাই। আমার ফেলে আসা প্রতিটি সূর্যাস্ত হেঁটে আসে আমারই কাছে। এই এতো বার এতো বার দৌড়ে যাই নিজেকে ভুলবো বলে, অতলে অতলে ছেড়ে রাখা খোলসটাকে উড়িয়ে দিই যাবতীয় বিশ্বাসে, তবু, জড়ো করা পালকের রং, তার প্রতিটি ভঙ্গিমা আলগোছে উঠে আসে গেরুয়া হলুদ বোধের অরণ্যে। লোনা লোনা অনুপ্রাসের মত নদীর খোলে শুতে আসে হেরে যাওয়া রামধনু। ঢালু হয়ে নেমে আসা দিনগুলো ভাঁজ করে বেঁকে যায় চোখের কোটরে। আমি তাকে চিনি-তার আঁচলার অলিতে-গলিতে-জরিতে মাঝে মাঝে পড়ে আছে আমারই শরীর আমারই ইচ্ছেমৃত্যু।

রংএর দিনগুলো ভারী অদ্ভুত- তুমি নেই। এ রাজ্যপাটে এ বিশীর্ণ পারাপারে তুমি নেই। তবু, তোমার ই আলোচনা। শাড়ি পরেছো? তোমার সেই ঘাসফুল হয়ে ওঠা শাড়ীটা এখনও জলের দিকে এগিয়ে যায়। তুমি কি জানো? বসন্ত কতদূর নিয়ে যেতে পারে? এ সবই প্রশ্ন সরলরেখার মত তবু দেখো মিথ্যে মিথ্যে খেলি, দাগ কেটে রাখি আমাদের আঙুলের নিয়ন্ত্রণগুলোতে।

আমার আকাশ আমার নীল জবাব দিয়ে দেয় আজ ""বেঁচে থাকা কোন প্রয়োজনে?'' তবু তার কাছে এসেই শরীরের সুগন্ধি আঁকড়ে ধরে তার মুখ। হেঁটে যাওয়া হরিয়ালি। আজ ঘুম থেকে ফিরে দেখি শহর জুড়ে তোমার ডালপালা - তিলে তিলে নিথর শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় হলুদ পাখির বীজ। তুমি কি জানো? অনেকটা পথ আলোর রাস্তায়, আরও একটু, আলোর মোরেম পেরিয়ে এলেই সে বসন্তের মাঠ - সে হলুদ দেশ। প্রতিটি শব্দ পিছু পিছু আসে। প্রতিটি শব্দ নদী হতে আসে। আমার হাড়ের ভেতরকার চিঠিগুলো, আলাপের আলাপচারিতাগুলো আজ বেশ লাগে।

তুমি তো দাঁড়িয়ে আছো, এই যে, একটু একটু করে ভেতরঘরের আন্দোলনে পা ডুবিয়ে। তার কাছে এসে তার সমস্ত বাষ্প-বরফের -হাড়ের ফাটলে ঝুঁকে পড়ে তুলে আনি এ অনন্ত স্তব্ধতা। একটি মেয়ের মুখ পড়শী বাড়ির মুখ অপেক্ষার মুখ অনুপস্থিতির মুখ- আমার বিশ্বাস আমার নয়নতারার মুখ। পাশ ফিরি মলাটের গাল ধরে অথচ দলবল নিয়ে মুখ ছাড়া পংক্তিগুলো ধুলো ঝেড়ে বসে। আউড়ে যায় ফিরে যাওয়া দু চারটে তারার কথা। আজও চালিত করে অলক্ষ্যে - ভিতরে ভিতরে আগুন লাগানো বিকিরণে।

শরীর থেকে উড়ে গিয়েছে যেসব অনুপস্থিতি, তাদের লিখি কীভাবে? তবু তো এ পাথরে ছিলাম, ছিলাম এ বসন্তের রজনে। শীত কি ছিঁড়ে যায়? শীত কি ছিঁড়ে যাবে? পাট মেলে দেওয়া দুপুরের গালে তোমার কতদিনের আঙুল-তোমার ফেলে রাখা আবহাওয়া। না বলে দাঁড়িয়ে আছে আজও। কয়েক শতাব্দী ধুধুটে গলি দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হয় ছুঁয়ে থাকো এ অনন্ত ক্ষয়ের সত্য।

আসলে, বসন্তের এই সময়টুকু আমি তোমার খবর জানি; অজস্র জন্ম ধরে তোমার মুকুল নেমে আসে রংএর ধুলোয়; কবেকার কথা সে মনে নেই, তবু যেন তুমি এসে দাঁড়াবে এ হলুদ চাতালে, হাজার ফাটল - আর চলকিয়ে যাওয়া অহংকার জাল পেতে তুলে আনি আমার দু অক্ষরে; ঠোঁটের আগে যে ঠোঁট, গুচ্ছ নীলের ছলাত- আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তারই আগে- হাওয়া দিচ্ছিল হলুদের গন্ধে লালের গন্ধে মুখ টিপে; মনে আছে তুমি বলেছিলে, ওভাবে তাকাবার কিছু নেই; আমি কুঁজো, কুঁজো হয়ে ডালা খুলে আগুন মিশিয়েছিলাম ভাঙ্গা দূরত্বে। এখন টলমল টলমল সমস্ত টিয়াপথ তোমারি দিকে-

পুরোনো ঘরে - কুঠুরি- কোঠরে আজ শব্দহীন পলাশ। একঠায় দাঁড়িয়ে গোপন সোঁদা কোল ঘেঁসে বসে; ছোট ছোট পায়ের শব্দে আজ আর কেউ নেই। মুখ তুলে দেখি তুমি রেখে গেছ ধ্বসের আবির; ফেলে আসা যুগলবন্ধী উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ফিরে গেছে আলোর বাতিলে। ঠিক এখানেই পোশাক বদলে নেব- বদলে নেব হলুদ রোদের থোকাগুলো; প্রিয় ঘাসফুল লুকিয়ে দেখবে আত্মবিলাপের মত আমাদের ফিরে যাওয়া; - কতক্ষণ হেঁটেছি জানি না তবু হেঁটেছি। প্রতিটি শিরায় শেকড় আঁকড়ে আঁকড়ে হেঁটেছি। জানি, আমার সমস্ত পথ পৌঁছতে পারবেনা তোমার বুনোটে; তবু, আজ যেন, কি পাইনি তার হিসেব মিলিয়ে পৃথিবী চলে যায় পায়ের শব্দে; যারা ঘুমন্ত তারা কি জানে তারা ঘুমন্ত? পোষাঘরে লুকিয়ে রাখা আমার অতল- তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? সেসব পরিযায়ী; মেঘ নেমে এলে খয়েরী চোখে, ছিটকিনি তুলে রেখে আসি পাতা উলটানো বিকেলে; কোথা দিয়ে যেন আজ এসে গেছে সারাটা শহর।

গাছেদের বলিরেখায় জিইয়ে রেখেছে শিমূলের অভিমান; যদি একা পাই আমার গোপন অসুখে, বসন্তের হাওয়ায় সমর্পণ করে দেব তোমার ফুল তোলা অনুপস্থিতি।

আমার ভরাট চিঠি আজ তো অনেক বছর হল-

তবু তোমায় কেন লিখি? কেন ছেড়ে আসি মনখারাপের ফিকেয়?

বোবা ছাদে লুকিয়ে দেখি

শুধু পলাশের জন্য

শুধু শিমূলের জন্য

কিছু খেলা

খেলা

খেলা

বাকিটুকু আজ----থাক না;

নদী হতে চাওয়া

রুমেলা বেলা

ইতি

আমি...

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০১০

হো৯

ফরিদা

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০

পিরীত অনেকদিনের পরে এলো বিনবিনে ঘামে আঠালো বিপরীত আলো তেরছা হয়ে ভরিয়ে যেতে দিল এলোমেলো। তখনো ভাবিনি একা শীতঋতু এতোটাই ভালো লাগত আমার। আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ছিলাম যে খোলামকুচি সারাগায়ে-সে এখন সব আলো ঝলমলানো দেখে ক্ষণিক হতচকিত।

জানি এসবের মাথামুণ্ডু নেই। কোনো এক জমিদারবাবুর উচ্ছৃঙ্খল ছোটোতরফের খেয়াল সব মরচে পরা হরফগুলো তেঁতুলজলে মেজে টাঙিয়ে দিল আকাশে। শামিয়ানা রোদ্দুর থেকে আলো ছেনে অপর্যাপ্ত রঙ এনে হাজির করেছে বলে আপিসের মেজো সেজো কর্তারা, গিন্নিরা মায় তাদের পোষা টিকটিকি সমেত সমাসীন সে উৎসবে। আসলে বদলে বদলে ফেলে ভাণ- ভণিতা, যাদের পোষাক-আষাক বলি চামড়ায় সেঁটে বসে থাকে। যা বলি, সব নেহাৎ কথার পিঠে কথা, যা বলি না সে সব সেই চামড়া ছেড়ে বের করে দেব, সে বুকের পাটা থাকলে তো আজ..... যাগগে সে সব।

যা বলছিলাম, সেই সব পরিধান মুক্ত হতে পেরে আমার থেকে আমাকে অবাঞ্ছিত রেখে দেবে এ শীতঋতু শেষে। ভাবছিলাম কতটা কেটে গেলে রক্ত সব লাল পলাশ হয়ে থাকবে এই শারীরি পথঘাটে। আর কত কুড়িয়ে নেব ফুল কতটাই বা ছড়িয়ে যাব ডিঙিয়ে আসা মৃতদেহে? এসো, মুক্ত হও - এই আহ্বান কতদিন পরে ফিরে এসে ডেকে নেবে- যদি চিনতে না চাই - যদি চোখ বন্ধ থাকে - যদি পলক পড়ে যায় আর ঘুমন্ত চোখ বোজা ছবি হয়ে যাই।

বাবুবিবি তো হাজিরা দিয়েই খালাস। পরিধেয় গচ্ছিত রেখে কথা বলা হবে বলে নির্ঘাৎ বিপর্যস্ত খানিক বা। আমার ভেতরে থাকা কথাদের নিয়ে ভাবিনা কিচ্ছুই, সে ভাষা শেখেনি বলে বুঝবে কেউ তার ভরসা নেই। নিজের কথা নিজের সাথে খোয়াই ছাড়িয়ে যাবে আঙুলে আঙ্গুলে রেখে। বিনিবিনে ঘাম হতে থাকবে - কিছু অল্প তেষ্টা থাকতে পারে, সঙ্গে নেবো তাকেও যদি আড়াল থেকে হাতছানি সব ডাকে। গোছানর কিছু নেই বলে না গোছানর খেলা এসে বাদ দিতে থাকি। তেষ্টা রাখবো, কিছু ভাষাহীন কথা, আর হেঁটে যাওয়া।

তাও এখনো বলা হয়নি রঙ কোথা থেকে আসে। আমি তো রঙ রাখিনি কোথাও। শুধু শামিয়ানা চোঁয়ানো রঙ রোদ্দুর যা নিয়ে এসেছিল। ওরাই থাকবে শুধু। দালানকোঠা পাবো আর কোথায়। শুধু তো হেঁটে যাওয়া ভাষাহীন। শব্দ থেকে চুঁইয়ে আসা অদ্ভুত টান যেন এক। ঘুঙুর পরে নেচে যাবে জল হাঁটুর ওপরে ওঠা শাড়ি সামলিয়ে দুলে যাবে সদ্য গ্রীষ্মঘোরে জেগে ওঠা কিশোরী। হে ভাষাহীন, ওকে সুর দিও কোনো - ডুরে শাড়ি মানায় এমন সুর। আমার সাথে দেখা হলেও হতে পারে এই বোধটুকু রেখে দেবো? থাক।

কোনো দরকার ছিল কি এসবের? ভারি তো শীতঋতু, এই উৎসব শেষে আবার তো সেই কথার পিঠে বলে যাওয়া শীতঘুমে আরামে সভ্যতা যাপন। তারই মাঝখানে অক্ষর পরিচয় ভাষাহীন মুক্তি এনে দেবে - বলে ফেলবো হয়তো এভাবে কোনোদিন। ডুরে শাড়ি কিশোরী কখন খুঁজে নেবে, মুখ থেকে মুছিয়ে দেবে বিনবিনে ঘাম, ভাষা এনে দেবে বলে হয়তো বা আমাকে খুঁজে পাবো, তাই হেঁটে যাব প্রতি উৎসবে। আজ চলি।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০১০

আগজা

নিনা গাঙ্গুলি

২২ মার্চ ২০১১

"হোলি', বিহারে সবচেয়ে বড় তেওহার। বাপরে সাজ সজ রব পড়ে যেত "ফাগুয়া আ গইল বা"। মা, দিদিরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ত সব্বার নতুন জামা কাপড় আর কাজের লোকেদের তাদের মনপসন্দ সব নতুন জামা কাপড় দেবার জন্য বাজার করতে। আমাদের ছোটদের, মেয়েদের হত সাদা অর্গ্যান্ডির ফ্রক--মা নিজেই সেলাই করত, পরে দিদি। আর মা একটা খুব নরম মলমলের লম্বা জোব্বা টাইপের জামা বানাত--ঐ ম্যাক্সির মতন আর কি! সেও একজনের জন্য--বলছি পরে কার। এ ছাড়া বাবার হাইকোর্টের মুন্সী নাত্থুজীর (মুসলমান, কিন্তু নতুন জামা পরতেন) লোয়ার কোর্টের চাপরাসী জানকী প্রসাদ এরকমও কিছু লিস্টে ছিল---আর ছিল নাগিনা ডোম!!

এই নাগিনা ছিল এক অদ্ভুত চরিত্র। রোগা ডিগডিগে বেখাপ্পা লম্বা, চোখদুটো সবসময় টকটক করছে লাল, পরনে নোংরা ধুতি আর ফতুয়া, নেশায় টলছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতনা--আর ছিল পিলে চমকে দেয়া বাজখাঁই গলার আওয়াজ! সব ছোটরা, আমরা খুব ভয় পেতাম ওকে। নেশাখোর নাগিনা মাঝে মাঝেই উদয় হত, বাইরে দাঁড়িয়ে বিকট চেঁচাত "বাবুজি নাগিনা ডোম আইলবা'। বাবা বেরোলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম আর "বাবুজি কাম দিউ, ভুখা বানি" টলতে টলতে দুটো নালাও পরিষ্কার করে উঠতে পারতনা, কিন্তু ভিখ নেবেনা, সেই জেদ ছিল। মাকে মাইজী ডাকত আর খুব ভয় পেত কারণ মা বলত--যা নহা কে আব" অত বড় মানুষটা ভ্যাঁ¡ ভ্যাঁ¡ করে কাঁদত, কিছুতেই চান করবেনা---কত রকমের বাহানা বুখার হয়েছে, গায়ে খুব ব্যাথা ইত্যাদি। রুটি গুড় আর চা এ ছাড়া কিচ্ছু খেতনা, দিলেও না। কখনও কখনও নেশার ঘোরে নালা পরিষ্কার করতে গিয়ে নালার মধ্যেই পড়ে থাকত। যাইহোক, এই নাগিনা এলেই একটা হৈ হৈ রই রই পড়ে যেত বাড়ীতে---বাড়ীর চাকর বাকরদের একটা মস্ত খোরাক ছিল এই মানুষটা----ওরা পেছনে লাগত "কেকর জোরু, তোরা মেহেরারু' বল্লে ও ভীষণ ক্ষেপে যাতা গালাগালি করত, ঢিল ছুঁড়ে মারত।

এই দেখ, হোলি থেকে কি আনহোলি কথায় চলে গিয়েছিলাম, সরি!

হোলির দিন সক্কালবেলা পুরোনো জামা পরতাম। ফুলহাতা জামা, যাতে গায়ে হাতে রঙ কম লাগে, আর সাদা জামা, রঙ লেগে বেশ খোলতাই হয় যাতে। গায়ে মাথায় আচ্ছা করে মাখতাম সর্ষের তেল মাখতাম - পরে চানের সময় ঐ বাঁদুরে সবুজ রঙ রুপোলী পেন্ট সটাসট উঠে যাবার টোটকা আরকি। তারপর কচিকাঁচা ছেলেমেয়ের দল বেরিয়ে পরতাম পাড়ায় ---বাড়ী বাড়ী ঘুরে খেলা--বাড়ীর সামনে গিয়ে হাঁক "বুরা না মানো, হোলি হ্যায়" সেই বাড়ীর লোকজন বেরিয়ে আসত রঙ খেলতে, আর যে বাড়ীর লোকজন বেরোতনা তাদের জানলা দিয়ে রঙভর্তী বেলুন ছুঁড়তাম (ইস,কি দুষ্টুই ছিলাম তাই ভাবি) আমি একজন পালের গোদা কারণ হাতের টিপ ভাল ছিল। অব্যর্থ। জানলা গলে বেলুন চলে যেত। এই করে সারা পাড়া হৈ হৈ করে সব্বাইকে

রঙ দিয়ে, নিজেরা ভূত হয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সেই বেলা একটা। শুরু হত "স্নান প্রজেক্ট' অনেক ঘষেও সব রঙ একদিনে উঠতনা। চান করে হাল্কা ঝোলভাত খেয়ে ছোট্ট একটা ঘুম---কারণ বিকেল থেকে শুরু হবে হোলির নেওতার খানা, পুয়া পুরী পাকওয়ান (হে হে পিনা ছিলনা, ধ্যুস!)

মেনু হত ডালপুরি, না না ছোলার ডলের নয়--অড়হড়-দাল তাও আবার সর্ষের তেলে সেঁকা ভাজা (বিহারী ডেলিকেসি, যে খেয়েছে সে জানে তার স্বাদ নয় "সোয়াদ') ঝাল ঝাল আলুরদম, মীঠা পোলাউ, গরগরে মাংস, ক্ষীর (ঘন খোয়া-ক্ষীর) আর মালপো। সারা বাড়ীতে কি খুশবু সেসব রান্নার! আর একটা জিনিষ মা বানাত চাল-ডাল আর আলু দিয়ে সাদা খিচ্ড়ী, ঘী পড়ত কিন্তু নুন না। এই সাদা খিচুড়ী একজনের জন্য তৈরি হত।

বিকেলে সব নতুন জামা পরে রেডি। বাড়ীতে আসতেন বাবার বন্ধুরা। বিকেলে ঠাকুরের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করে তারপর গুরুজনদের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করে শুরু হত বিকেলের আবীর খেলা--সুখা হোলি। সবাই সবাইকে নানা রঙের আবীরে রঙীন করত--শুরু হত খাওয়া-দাওয়া। সিয়াবাবু কি একটা শরবৎ বানিয়ে আনতেন, শুধু বড়দের জন্য, আমরা বাদ (হে হে এখন বুঝি ভাঙ্গের) কত হাসি গল্প ঠাট্টা, মা দিদিরা গান গাইত, আমরা ছোটরা কবিতা বলতাম। গুরুবচনচাচাজী শায়রি বলতেন।

ও হ্যাঁ¡ আমাদের বাড়ীর পাশে গুরুদয়াল অ¡র উত্তীমলালের খাটাল ছিল। এই দুই যাদবভাই হোলি সিজন মাতিয়ে রাখত। রাত নটা-দশটা থেকে শুরু হত তাদের যাদব-গোষ্ঠীর হোরি-ধুন চৈতি গান (হা হা গান না gun) হেঁড়ে গলায় সুরের ভুষ্টিনাশ, তার সঙ্গে ঢোলক ডুম্ডুমাডুমডুম ধ্ম, ঠনঠনাঠন খঞ্জুনি --মাঝে মাঝে পাড়ার নেড়ি কুকুর গুলো ভয়ে উঁউউউউ করে কেঁদে উঠত (না গানে যোগ দিত, কে জানে) আরও রাত করে শুরু হত নৌটঙ্কি নাচ --কি হুল্লোড়! ছোকরা মেয়ে সেজে নাচত যদিও--তা তাও আমাদের ছোটদের দেখা বারণ ছিল--কারণ ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি বেশ R রেটেড হয়ে উঠত। ঐ খুব চুরি করে জানলা দিয়ে একটু আধটু যা দেখেছি--খুব রাগ ধরত বড়দের ওপর--সবতাতে যে কেন এত না না ছিল, উফ!

তো, এই হোলির নেওতায় নিয়মিত ছিল নাগিনাও। আসত বিকেল পাঁচটা নাগাদ। মা ওকে তেল, সাবান নতুন গামছা আর জামা কাপড় দিত। ঘষে ঘষে চান করত সে, ঝাঁকড়া চুল পরিপাটি করে ঝুঁটি বাঁধত। পরিষ্কার চেহারা, নতুন ধুতি-ফতুয়া পরে বেশ ভাল দেখাত। চেনাই যেতনা। আর সেদিন সে থাকত একশ শতাংশ সোবার, কোনও নেশার জিনিষের ধার দিয়ে যেতনা। আমাদের ছোটদের একটা করে নিজে হাতে বানান তালপাতার সেপাই গিফ্ট দিত আর হেসে বলত "ডরো নহি খোখি, ই হই আচ্ছা আমদি নাগিনা'। আমদি হল গিয়ে পাটনাই ভাষায় আদমি।

তো, এসবের বহুদিন আগের এক হোলির কথা। আগজার দিন, হোলির আগের দিন যেদিন রাত্রে হোলিকাকে পোড়ানো হয়। নাগিনা তখন জোয়ান মরদ। কয়েকটি উঁচা ঘরানার বড়লোকের ছেলেরা, যারা এখনও বিহারের

রাজনীতি দাপটে বেড়ায়,সেদিন কোনও গ্রাম থেকে একটি গরীবের যুবতী মেয়ে কিম্বা বউকে তুলে এনে, তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। নাগিনা ডোমকেও টাকা, গাঁজা ভাঙ্গ মদ নিজেদের থেকে পরসাদি দেয় এবং ভোগ্যা মেয়েটেরও পরসাদি পায় নাগিনা। নেশার ঘোরে কারুরই জ্ঞান ছিলনা। এবং যাবার আগে মেয়েটিকে পুড়িয়ে দেবার ব্যাবস্থা করে যায় ঐ নাগিনা ডোমের সাহায্যে --নাগিনার যখন হুঁশ হয়, তখন বহু দেরী হয়ে গেছে। আর মেয়েটিও এতই দুর্ভাগা যে সে পোড়ে সাংঘাতিক ভাবে কিন্তু মরে না। সেই আধপোড়া মেয়েটিকে নাগিনা নিজের খোলিতে রাখে, সাধ্যমত সেবা করে বাঁচায়--কিন্তু সে চোখে ভাল করে দেখতেও পেতনা, কোনও কিছু চিবিয়ে খেতেও পারতনা আর শুধু গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর তার কোনও ভাষাও ছিলনা। সেই পঙ্গু দলা পাকানো মেয়েটির কেউ কোনওদিন খোঁজ করেনি---নাগিনার কাছেই সে থেকে গেছে।

এরই জন্যে প্রতি হোলিতে ঐ সাদা খিচুড়ী, মলমলের আলখাল্লা -জামা, ক্ষীর মালপো বুকে করে নিয়ে ----সারা শহর যেদিন ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি আনন্দে মেতে থাকে ---রোজকার নেশাখোর নাগিনা---১০০% সোবার, লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের বাড়ীর গেট পেরিয়ে চলে যেত-- --আর একটি অনুতপ্ত হোলি উদযাপনে!!

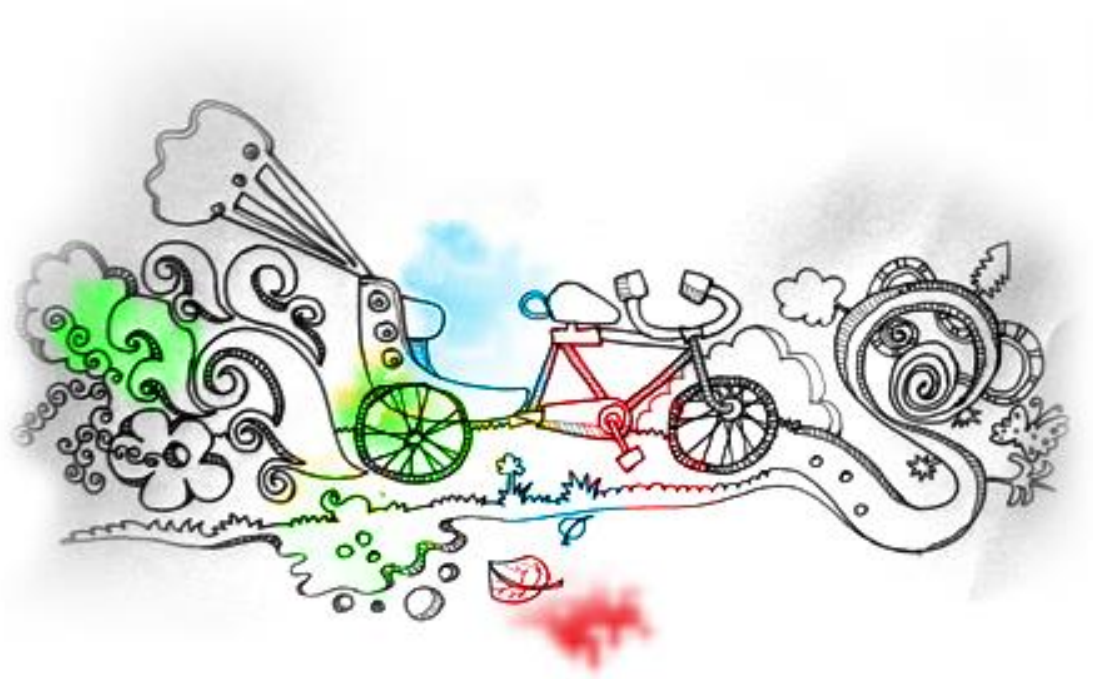

কাব্যি

রং না দিলেও

ফরিদা

১৮ মার্চ ২০১১

নেহাৎ কিছুর ধার ধারিনি, নয়ত কিছু বলার ছিল। পাতা ঝরার সময় এলেও অন্য কোথাও মুকুল ছিল। ছিল যেমন চলতে থাকা অন্ধকারে হয়ত কোনোও আলোর দিকে। ছিল যেমন একফালি রোদ ঘুরতে ঘুরতে ঠিক এ সময়ে চেয়ারাটুকুর পা মুছিয়ে দিচ্ছে দেখে, ফিরতে হল। নেহাৎ কিছু কথার কথা এলোপাথাড় ঘুরতে এসে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আটকে দিল।

ধারবাকি সব তোমার কাছে - সব তামাদি বলতে গিয়েও বলছি ফেলে, বলার ছিল।

তোমায় যখন দেখি সে এক অন্য মানুষ। রাস্তা চলতে পিঁপড়ে এলেও পাশ কাটাবে এমনধারা। সমস্ত রাত দেয় পাহারা সারাদিনের তন্ন তন্ন খুঁটে পাওয়া খোলামকুচি। যেসব কেবল খেলার ছলে ছড়াও তুমি রাস্তা জুড়ে। কিম্বা সেদিন বারান্দাতে দাঁড়িয়েছিলে একটু ঝুঁকে। রাস্তা তুমি দেখছিলে না। আকাশটাতেও চোখ ছিল না। কেমন একটা শূন্য কিছু ধরতে চেয়ে আপন মনে ভাবছ কিছু। আমি তখন হাঁটছি দেখ ওড়াই ঘুড়ি পেতে নাগাল তোমার ওসব ভাবনাটুকুর। তাতেই দেখি টাপুর-টুপুর শুরু হলে আমার ঘুড়ি বিপর্যস্ত দেখছি আমি সেই বারান্দা মেঘ হয়ে যায়, বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে।

এমনিতে তার তেমনিতে সে দিন যা ছিল দাউ দাউ সব জ্বলতে থাকা জ্বালতে থাকা। স্কুল বা কলেজ কোথাও একটা যেতাম তখন এদ্দিনে সব ভুলেও গেছি। ছুটি ছাটা থাকত লেগে গায়ের সাঙ্গে ঘামের মতো। সমস্ত দিন গয়ংগচ্ছ, পুচ্ছ তুলে এদিক ওদিক, বাড়লে বেলা চান খাওয়া শেষ। ভন্যি দুপুর খেলতে থাকা রাবার বলের ফুটবলে সব পোক্ত হলাম। নখের পাশে চামড়া কেটে রক্ত পড়ে, না পড়লে তাই নীলচে রঙের কালশিটে সব সাজতে থাকে।

এরই মধ্যে ছিল একটা রাস্তা যেটা বাজার যেত। আমার পাড়ার গলিখুঁজি পার করে সেই হঠাৎ করে চওড়া রাস্তা প্রসারতার জন্ম দিত। সেই রাস্তা জানতো শুধু সাজতে কেবল, আর তাছাড়া আর কোনো তার কাজ ছিল না। মাঝে মধ্যে একটা দুটো হলদে কালো ট্যাক্সি যেত ঝকাম ঝকাম। দুপুর হলে লাইন করে খান চার পাঁচ হাতে টানা রিক্সা আসত খাবার খেতে। সেই রাস্তার ফুটপাথে সব চাঙরাগুলো এবড়োখেবড়ো করেছে সব কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া। ফেব্রুয়ারীর শেষের থেকেই সবার সামনে পোষাক তাদের ছাড়তে হবে। একে একে হলদে পাতার চাদর টেনে শীতের শেষের ওমটুকু সে রাস্তা পুরো চুমুক মারে।

কাদিন পরেই সেই রাস্তার ভোল পুরোটা বদলে যাবে। দামড়া দামড়া গাছগুলো সব কী নির্লজ্জ। পাতার পোষাক প্রায় পুরোটা ঝরিয়ে ফেলে আদুল গায়ে যত্ন করে ফুল ফোটাচ্ছে। এই কদিনের মধ্যে পুরো রাস্তা যেন দখল করে হলদে লালে ভরিয়ে দেওয়া পাপড়িগুলো।

রেশন বাজার ফেরৎ এসব আমি দেখছি তবু ভ্রুক্ষেপ নেই এই রাস্তার। রেশন বোঝাই ব্যাগের ভারে ডানদিকটা একটু যেন নুইয়ে গেছে। লাইন ছিল দোকানে আজ হঠাৎ করে পড়লো গরম। খবরটবর থাকত তখন কোনদিন সেই রেশন দোকান দরাজ হয়ে সেদ্ধ চালের বস্তা খোলে। কিম্বা ভালো গম এসেছে তেমন কিছু। সেদিন এমন চালের ব্যাগ আর গমের ব্যাগে নুইয়ে আমি ফিরছি তখন রাস্তা জুড়ে হলদে লালে মারপিট খুব। তারই মধ্যে সাড়ে দশটার মিচকে পোড়া রোদ্দুর সে গাছের আনাচ-কানাচ থেকে তুলছে ছবি। এ প্রেক্ষিতে চোখ না তুলেও বুঝতে পারি ঝুলবারান্দা আলো করে দাঁড়াও তুমি। রাস্তা তুমি দেখছ না সে জানি আমি। আকাশেও যে তাকাও নি তার খবর রাখি। আরো একটু নাগাল পেতে ওড়াই ঘুড়ি তাতেই সেই ঝুলবারান্দা মেঘে ঢাকা। টাপুর টুপুর বৃষ্টিতে সেই ঘুড়ি কোথাও যায় হারিয়ে।

সেই সেদিনের বেয়াক্কেলে রোদ্দুরে যা ভাসার ছিল ভেসেই গেল। এর কদিনের মধ্যে আবার দোল পড়েছে ক্যালেন্ডারে। আমাওরা কজন বাউন্ডুলে ভুত সেজেছি সকাল থেকেই। নিজের থেকে লুকোই নিজে জামা কাপড় তেমন ভিজে। এই এপাড়া থেকে আবার সেই ওপাড়ায় ঘুরতে থাকি দঙ্গলে সব। গুঁড়ো রঙের ছোট্ট একটা টিনের কৌটো ডানপকেটে। সঙ্গে আছে লাল আবীরের প্লাস্টিকও এক। বন্ধুদের বাড়ি গেলে বড়দের পায়ে দিতে হয়। এদিক ওদিক সেদিন প্রচুর হই হল্লা। বাড়ছে বেলা। আস্তে আস্তে দোলের সব খেলুড়েদের বাড়ছে বয়স। রাস্তা জুড়ে ছুটতে শুরু করছে কিছু বেয়াক্কেলে বাইকওলা দু-তিনজনকে পিছনসীটে বসিয়ে নিয়ে। হুডখোলা বেশ চার-পাঁচটা জীপের লাইন ছুটে গেল তারস্বরে হর্ণ বাজিয়ে। ফেরার পথে দেখি আমার দঙ্গল সেই বাজার যাওয়া রাস্তাটি নেয় হঠাৎ করে।

তখনো সেই রাস্তা নিজের পাপড়ি নিয়ে খেলেই যাচ্ছে। তার মধ্যেই সাত্যিকারের দু-একটা পোঁচ রঙ ছড়ানো আশেপাশের বাড়ি থেকে উড়ে আসা রঙের বেলুন। কোথাও যেন এমনকরে রঙ পড়েছে কেউ বুঝি তার খুব পুরোনো বন্ধুকে আজ প্রাণ ভরে আজ রঙ মাখালো।

ঝুলবারান্দা খালি ছিল। দেখার জন্য সেই সেদিনেও চোখ তুলিনি, বুঝতে পারি। কিন্তু তাদের গেটে এমন জটলা ছিল। কয়েকজনে মিলে বেশ ঢোল বাজিয়ে গান জুড়েছে। উড়ছে আবীর ইতস্তত:, রঙমাখা সব মানুষজনের ভিড়েও আমি দেখছি তোমায়। তাতেও আরও রঙীন হয়ে টুকরো টুকরো সুর সমূহ বিঁধছে আমায় বুঝতে পারছি। মাথার ওপর গাছের ঝালর থেকে কিছু চুঁইয়ে আসা আলোয় তুমি মেলাও গলা হে ঈশ্বরী তাতেও আমি দিশেহারা। আশেপাশের বন্ধুরা সব কোথায় যেন। সম্মোহিত আমি আরো যাই এগিয়ে ঢেউ যেখানে নিজেই ভাঙে আকাশছোঁওয়া। আমার সাঁতার না জানাটা কাজের এমন হতে পারে আর ভাবিনি। ডুবতে হবে সেই যেখানে সেখান থেকে ফেরার হিসেব ধার ধারিনি।

সেই কজনের ভিড়ে আমি ছিলাম খানিক আবিন্যস্ত। ভিড়ের মধ্যে একজন তো, তাতেই হবে। ঐকতানের মাধ্যে হলেও ঠিক আলাদা আওয়াজটি তার চিনছি তাতেই ফিনকি দিয়ে রঙ ছড়ালো শব্দগুলো। আবীর প্যাকেট হাতেই ছিল। নিজের কাছে অচেনা তাও তোমার কাছাকাছি ছিল। রোদ্দুরে সব ঝলসে ওঠা অভ্রকুঁচি চোখ ধাঁধিয়ে, সেই সুরে এক ডুবতে থাকা খুব অচেনা আবেশ ছিল। ইচ্ছে বলে কিছু একটা অল্প আবীর দিতে চাওয়া অনেকাদিনের স্বপ্ন ছিল। সেই আবেশে ভেসে গিয়ে ভুল ঠিকানায় ঠিক কথাটা স্রেফ একটিবার বলার ছিল। হাজার হাজার রঙের ফোঁটার সেই একটাই জীবন ছিল।

তোমার কাছে অন্য মানুষ সাদা কালোয় ফিরে এসেও - সেই কথা যা বলার ছিল।

ছুঁয়ে দিলে উঠে বসো শিহরণ

সায়ন্তন দে

১৮ মার্চ ২০১১

রামকিঙ্করময় ছেলেবেলা নিভৃতে পথ হেঁটেছিল যেদিন মায়াসার চুপকথা পার হয়ে উপত্যকা বনানীর জালিকাবিন্যাসে বিনষ্টপ্রায় শুকনোধারা নদীর ভাঙতে থাকা পাড় ধরে চলে যায় চলে যায় নিরভ্র দ্যুতি নিরন্তর বিস্তার উপেক্ষা করে সূর্যডোবা মনোজদের পোড়োবাড়ির ভিত পার হয়ে পায়ে জড়ানো আলগোছে আবদার সেইসব খুঁটিনাটি যেগুলো অক্ষর হয়ে ভেসে গেছে দু'কূলছাপানো প্লাবনে নৈঋতে অশ্বমেঘে গুরুগর্জন ধূমনীল মরুকন্ঠস্বরের মত শুকনো কোনও দুর্বল ডাক কখনও দুর্ব্বার হাতছানিতে ক্ষয়ের ছদ্মবেশে লজ্জাময় চড়ের মত এঁকে দেওয়া সেইসব পাঁচ আঙুলের স্পষ্ট দাগ ফুটিয়ে তুলে যাতে হাত বুলিয়ে বুঝতাম ছেলেবেলা হারানোর অমোঘ শব্দ কারুর এগিয়ে আসবার ভয়ের পরিখা পার হয়ে স্বপ্নের বিভিন্ন আস্তরণ ভেদ করে কায়াহীন অবয়ব জ্বর হয়ে নামবার সময় এসেছে শরীর জাগানো রক্তচাপ নিয়ে চিলেকোঠার ছোট খুপরি ঘরটায় আমার সাধের সরস্বতী তছনছ করে দিতে সুলেখা কালির দোয়াত উলটে দু'হাতে নীল মেখে আকাশ দেখেছিলাম প্রথম দেখার উচ্ছ্বাসে যদিও আকাশ ধুয়ে যেতে পারে প্রথম জানা হয়েছিল জলের ধারার নীচে যা বৃষ্টি নয় তা নিয়ে অশান্ত ছিলাম কারণ তা আমার নয় এটা বুঝিয়ে টুপ টাপ নীল থেকে নম্রনীল হয়ে একসময় স্বচ্ছতায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছিলে সামগানের স্বেচ্ছাচারিতায় মাটিতে লুটিয়ে কখনও মুখে বালিশ চাপা দিয়ে প্লাবন নামিয়ে তবু পালকের মত তুলো ভেজেনি একটুও অথবা রক্তচাপ শুষে নিয়েছিল ব্লটিং পেপারের মত উদ্বৃত্ত রোমকূপ থেকে কুহুগান কলতান নিছক পাঁচমেশালি রান্নার সুবাসঘেরা ছুটির দিনের সকালের মত যেরকম সময়ে অনেক অনেক ভাবে অচেনা দৃশ্য দেখিয়েছ তুমি চমকিয়া বিদ্যুৎ রহস্যের অবগুন্ঠনটুকু রেখে হৃতপ্রায় ছেলেবেলার সেইসব প্রথম সবকিছু একটা একটা করে চলমান এক সম্পূর্ণ আকাশভরা মায়াঞ্জন ভালোবাসতে তুমিও মিশে যাওয়া চুড়ির টুকরোর মত তীক্ষ্ণতায় অসতর্কতায় নীল শিরা ভেদ করে শরীরের অল্প গভীরে অস্তগামী আকাশের মত লাল চুড়ির ভাঙা আভা সরিয়ে যত্ন করতাম অপটু অদক্ষ কাঁপতে থাকা হাতে স্বেদগ্রন্থীর বদান্যতায় ধরা পড়ে যাওয়া মুচকি হাসির পিছনে যদি এক মুহূর্ত্ত যন্ত্রণা ভুলতে সেই অনিপুণ অপ্রস্তুতিকে ক্ষমা করেছি বহুবার লুকিয়ে আরেকটু দেখতে চাওয়ার মত অনায়াস আবদারে ইঁট-কাঠ-পাথরের জঞ্জালভরা শহরকে প্রাণ দান করেছি আমার সম্রাজ্ঞীর চলার পথের ধার পলাশের গুঁড়ো রাঙিয়ে রাখার মত কৌতূহল উদ্দীপক স্নায়ুর কেন্দ্রে উত্তেজক রসায়ণের সমৃদ্ধি ঘটাতে চেয়ে আর নচিকেতাও অত্যাচার করেছেন নীলাঞ্জনায় ডুবিয়ে তাও নি:শ্বাস বন্ধ হয়নি কখনও বরং এটাই বুঝেছি নিমজ্জনে আর ভয় নেই বড়ো হয়ে ওঠার দৃষ্টিকটু অবাধ্যতায় আর কখনও বশ্যতা স্বীকার করবো না যদি এক-পা দুই-পা হাঁটি হাঁটি স্রোতের অভিমুখে চলতে থাকি যদি পিছনে পায়ের শব্দ না বাজে ধরে নেব তবে ছায়া অনুগামিনী স্বৈরিনী স্কন্ধকাটার মত একরোখা কিন্তু ঝাপসা অংশ সাদা হয়ে যায় হতেই হয় সাদা কোনও রঙ নয় শুধুই বর্ণহীনতা তাই তোমাকে আজ উপহার দিলাম কিছু যৌগিক রঙ -

লাল + হলুদ = কমলা

হলুদ + নীল = সবুজ

গোলাপী + নীল = বেগুনী

কালো + হলুদ = ঘন সবুজ

সবুজ + নীল = ময়ূরপঙ্খী

কলেজবেলা, দোলের দিন

সোমনাথ রায়

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০

কলিম খান মহাশয় ব্যাখ্যা করেছেন, পালকের পালয়িতাকে পাপ বলে, অর্থাৎ যাকে আমরা পালন করে চলেছি, সে যখন আমাদের কার্যসিদ্ধিতে আসে, তা-ই পাপ। সে হিসেবে নিচে লেখা কবিতাখানি পাপবিদ্ধ। দশবছরের বেশি আগে একটা এক্সাইটিং দোল এসেছিল জীবনে, স্বতস্ফূর্ত ভাবে কবিতাও। সুমনের গানে আদ্যোপান্ত ইন্সপায়ার্ড পয়ারের মতো: 'জানিনা কজন বুড়ি ছুঁয়ে গ্যাছে আর / আমি কিন্তু পরীকে ধরেছি হাতে / আমার কবিতা গান হয়ে মাঝরাতে / জল আনতে কুড়োয় নদীর পার। / আমিও হঠাৎ তোমাকে স্পর্শ করি / পলকের রঙ লাগাই তোমার গালে/ বসন্ত জেগে উঠলো কোকিল-ডালে / তোমার আবিরে কলসী তখন-ই ভরি।' এর পরের অংশগুলো স্মৃতিকোষ থেকে মুছে গ্যাছে। এদিকে সম্পাদিকা বললেন দোলের কবিতা দিতে, হাতে সময় পনেরো মিনিট। আর সেই কলেজবেলার সারল্য নিজের মনে গুনগুন করা ভালো, ইন্টারনেটে ছেপে ফেললে খোরাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং দশ বছর ধরে বহন করে যাওয়া শব্দ, কবিতা কবিতা চাপগুলো আর টুকরো টুকরো মনে পড়া ছবি দিয়ে পড়তে ভালো লাগে এমন একটা টেক্সট নামিয়ে ফেলা। যা হলো, তা প্রকৃতপ্রস্তাবে পাপবিদ্ধ-ই:

কলেজবেলা, দোলের দিন

তখন বৃষ্টি নামতো, নামতার মতন

ধারাপাত ধারাপাত

সংখ্যার মত নেমে আসতো সেই সব দুপুর যারা

কলেজের পথেও অচেনা;

অচেনা অক্ষর এসে দাঁড়াতো পথ জুড়ে

বর্ণমালার থেকে ঢল বেয়ে নেমে আসে

জলের লাইন,

তখন বৃষ্টি নামতো

নাম রাখা ছিল, ঠিক মিথ্যের মতই:

গোপনে সাজিয়ে তোলা,

আড়ালে গিয়ে আবির মাখানো

তাক করে ছুঁড়ে দেওয়া বেলুনের মত,

আকাশের বুকে বুকে উড়ে যাওয়া

রঙিন আড়াল

তখন বৃষ্টি নামতো,

ম্যারাপে বাঁধা থাকতো ফেস্টিভ্যাল

পাহাড় ছাড়িয়ে এসে যেত

ভাঙখেত, ফাঁকা বাসে বিষণ্ন বাড়িফেরা-গুলো

রঙের আড়ালে থাকতো তাক করে ছুঁড়ে দেওয়া ধুলো, আর,

নীল ওড়নার পথ বেয়ে

নামতার মতো করে ঝরে পড়া বর্ণমালা

জলরং, বৃষ্টি, আবির।

এই বসন্তে

মিঠুন ভৌমিক

১৯ মার্চ ২০১১

বসন্তে এক গাছের খোলস, নির্বিশেষে
রং মেখেছে নিজের কাছে, একটু গোপন
আনন্দ তার শিরায়, উপশিরার স্তূপে
শক্ত করে হাত ধরেছে, একা একাই।

জেল্লা যতই কমছে রঙের, ততই ঘুমে
টলছে দেওয়াল, একাই যখন দাঁড়িয়ে আছে
লাল না সবুজ, নীলের অঙ্ক মেলেই যদি
আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যেও, স্টেশন এলে।

লাল আবিরে রাজনীতি আর মন্দগতি
কালচে সন্ধ্যে, বসন্তকাল, উৎসবেরো
এখন নিত্য লোডশেডিঙের গর্ত খুঁড়ে
আলগোছে তাক করেই যদি, দোষ দিওনা।

চামড়া যতই জ্বলবে এখন, ততই মজা
লালচে আভা ফুটছে যতই, কালচে সবুজ
কানের পেছন, চোখের নিচে হালকা জলে
জলছবিতে রং লেগেছে, জীবন্ত রং।

এমন দিনে, একটূ আধটু স্পর্শ কোরো
হাওয়ায়, ধুলোয়, দুপুরতাপে খেই হারিয়ে
জানলাধারে বসোই যদি, আলসেমিতে
ফিরবে সময়, সেই ভরসায় অনন্তকাল।

মিল

রবাহূত

২২ মার্চ ২০১৯

তখন স্নানের পর ধুয়ে ফেলে বাঁদুরে বেগুনি
জোর করে খুঁড়ে আনা মিল
পিঠ ভেজা জলদাগে দুপুরের উদাস সারং
দীর্ঘ কাঁপানো শিষে ডাক দিয়ে ফিরে আসে চিল।
উৎসব শেষ হলে ছোঁয়াছুয়ি হঠাৎ বারন
অনামিকা ছুঁয়ে দেওয়া ছুঁয়ে দেওয়া থুৎনির তিল
ছবিগুলি বেঁধেছেঁদে রেখে দিয়ে বইয়ের পেছনে
কোনকালে কাজে লাগে মিল দিতে তখন ভাঁড়ার।

জলকলে সুবাসিত ফুল ঝরা বৃহৎ কড়ই
মদির করেছে কবে রংধুলা মাখা ঝিম রোদ
সেসব তাকের থেকে পেড়ে এনে রুপালী পোকার রুট ধরে
মিল দাও, নচেৎ কিসের হৃদয়।

বসন্ত উৎসব

রবাহূত

২০ মার্চ ২০১১

আবাহন করি পদ্য
স্বচ্ছ পাত্রে মদ্য
অনুপানে আছে সদ্য
ক্রিস্পি ফ্রায়েড তোপসে

বিবাহযোগ্যা শব্দ
অবিনয়ে রেখে জব্দ
আনবাড়ি হৃদি অব্দ
পলায়নপর বনপাস

এসব স্টেশনে রেলপথ
থামেনা বিশেষ রোজ রোজ
চলে যাই শুধু রংরুট
দোল চলে যায় চুপচাপ

এদেশে একটু ফুলমুন
বনে জঙ্গলে দৃশ্য
গ্রীষ্মে এবং বর্ষায়
চক্ষে জাগায় রক্ত

আমিও তো অনুরক্ত
কাঞ্চনে টাকা পয়সায়
কি করে হিসাবপত্রে
সুখে থাকে শিশু কন্যা

আসলে এসবই ক্লিষ্ট
গোলাপী চাদরে ইবলিশ
বিবাহযোগ্যা শব্দ
দৃষ্টি এড়ায় দিনরাত

ছাইচাপা আছে কৈশোর
ইঁটচাপা খর যৌবন
মধ্যবয়সে চেকবুক
সিঙ্গলমল্ট মদ্যে

হিসাবে নিকাশী তন্ত্র
অপ্রকাশ গূঢ় মন্ত্র
মর্মে থিতনো অম্বল
হোলিকার ষড়যন্ত্রে

পোষা আছে হৃদি, পথঘাট
লোষ্ট্রে পাথরখন্ডে
শুষ্ক হয়েছে গুপ্ত
তার দাগ, খর গন্ডে

দোল বিষয়ক প্রিল্যুড

শ্রীদর্শিনী চক্রবর্ত্তী

২৬ মার্চ ২০১১

হাওড়া স্টেশনের বাইরে যেটুকু ভোর
কৌমার্য বজায় রেখে আকাশের গায়ে লেগেছিল,
সেটুকু সন্তুষ্টি নিয়ে পেয়ালায় সিরিয়াল-চুমুক দিতে দিতে
দীর্ঘ-দৃষ্টিপাত নাতিদীর্ঘ বৃষ্টি-সেলোফেনে মুড়ে নেওয়া গেলো।
এরপর লঞ্চের ভোঁ,
এরপর ক্যামেরা-সিনড্রোম,
আক্রান্তের মধ্যমায় বসন্তের গুটি জেগে ওঠে।
দোল-বিষয়ক আজ আপামর বন্ধুগণ লালমাটি-গন্ধ মেখেছে -
শূন্য কলেজ-পাড়া, এদিকে সিরিন রেড রোড
বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা আয়োজিত,
ছড়িয়ে পড়ছে লালের আভারা
ছড়িয়ে পড়ছে অবিন্যস্ত দোল

রাত ভিনেৎ

অভীক কুমার মৈত্র

২০ মার্চ ২০১১

নষ্ট আবীর মেখে
একা একা জ্যোৎস্নায়
দোল খেলে যক্ষ্মারোগীরা
বাতাসের রস টেনে
খুকি সাজে বুড়ি চাঁদ
লাল হয় শিরা-উপশিরা
সে গোলাপী চাঁদমুখে
প্রজাপতি বাসা বাঁধে
ডিম পাড়ে সহজাত ছাঁদে
নোংরা ও ফুটিফাটা
সেলোটেপ দিয়ে সাঁটা
কবিরাই রূপ খোঁজে চাঁদে
নদীর বেগমজলে
ছ'তলার নবাবের
কামনার এপিলোগ লেখা
কুয়াশার কোল ঘেঁষে
আধপোড়া কুকুরের
ধুলোর বিছানা পাতা, একা।

বাউলের সাথে পলাশ ফুল

সায়ন্তন গোস্বামী

২২ মার্চ ২০১১

বাউলের সাথে পলাশ ফুল, প্রকারান্তে
ভস্ম আছে অনেক ;
মেঘ দূরে ঠেলে ওড়ে খিদে,
চক্রবাত লাল কাঁকড় ভরে
পার্বণ এসে দ্যায়
রঙের ছোঁয়া,
পাপস্খালনের আবিরে ধোয়া, বলে
বাউলের থেকে শেখ -
ঋজু কেমন একতারা,
পদ্মজলে ভাসমান, নির্নিমিখ
পাখি তেরছা ভাবে বসে তাতে,
দৃষ্টি দ্যায় রঙের গুঁড়ো -
নজরকাড়া, যাতে
ডাঙ্গায় নাবিক করে হেলা,
বিষন্ন দুপুরবেলা,
এ বৎসরে রঙ নিদ্রোত্থিত
ঘনসন্নিবেশে ধুলো,
চিরস্থায়ী দাগের আশায়
বাউলের সাথে বহুদূরগামী
দোল খেলা হলো।

দোল-ভাট

সুবীর ব্যারেটো

২৬ মার্চ ২০১১

হোলিতে আজ হুলোর রং-এ রঙ মেশাবে মেনি।
আড়ীয়া মেরে সাইজ করবে যতেক লেডিকেনি।।
নোবেল-হারার জ্বালা জুড়োয় এম এ করিমের চূর্ণ
শাওলি- শালোনী কালচার কলোনী টপ টু বটম পূর্ণ।।
আজি ঠেকলে কনুই ঠেকুক যথা পদ্মকাঁটা শোভে,
দোলফাগুনের ঢিমে আগুনে জম্পেশ আঁচ হবে।।
দেড়শো বচ্ছর তিলে খচ্চর বাংলো মারিয়ে প্রান্তিক,
বাংলো গাত্রে মুতবে যারা অস্ত্রে তারা শাণ দিক...।।

ফাগুন

অর্পণ চৌধুরী

২০ মার্চ ২০১১

থালার মতন চাঁদ, আবিরে আবিরে উলোঝুলো
শ্রীমুখটি উঁকি মারে অনন্ত সে নক্ষত্রখামারে,
অলৌকিক ইস্টিশনে, উত্তরের জারুলের বনে,
ঘুমিয়েছে গৃহবাসী, পরিত্যক্ত জলছবি, জাগে
এখন বারান্দা জুড়ে এলোমেলো বিষাদহাওয়া

যমুনাজলে দামিনী ভাসে, ডোবে, দ্যাখে সাতরঙ্গী
অমিতাভ আর রেখা, রেখা আর অমিতাভ, ক্রমে
যেন যুগল তাহারা, দোমেটে কাঠামো জুড়ে লাগে
রঙ, প্রথম সেদিন, অনাঘ্রাত নীল সালোয়ারে
জেনেছিলে কাকে বলে সুবাসিত ফাগুনমঞ্জরী?

হোলি

বিক্রম পাকড়াশি

২০ মার্চ ২০১১

রোমকূপ ফিরিয়ে দিল একবিন্দু ঘাম

বসন্ত উৎসবের আগে।

সে আমাকে দিয়ে যেতে চায় প্রচণ্ড সংগ্রাম

আমাকে সে দিয়ে গেছে পোখরাজ, মরকতমণি

এবং প্রবাল সাগরে ডুবে, এমনকি,

জাহাজডুবির অন্তরালেও

আমাকে সে নিয়ে গেছে।

মনে করো না কেন ফিরে এসেছি রোমকূপ থেকে?

তার শরীরে তো এখন কাঁটা লাগে

হাওয়া এসে তাকে নিয়ে যায় মায়াবী পুজোয়,

আর তারা তীব্র রঙে ঘুরে পড়ে যায়,

কারা যেন মাথা নিচু করে গোল হয়ে নাচতে থাকে চারিদিকে

রোমকূপ ফিরিয়ে নেয় এক বিন্দু ঘাম।

এই বসন্তে

সোমনাথ রায়

২২ মার্চ ২০১১

এবার ছুটিতে যেতে দাও

এই বসন্তে আমি ইতিমধ্যে জ্বালিয়ে ফেলেছি পাতাঝরা জঞ্জাল সব

এখন আকাশে শুধু পলাশের রক্ত মাখানো

এবার বাড়িতে যেতে দাও

এই বসন্তে আমি খাঁচায় বন্দি করে এসেছি কর্কশ ক্রৌঞ্চবিরহ

এখন গোঠের পথে আলুথালু দখিনা বাতাস

এবার স্মৃতিতে যেতে দাও

এই বসন্তে আমি গুটিয়ে রেখেছি রংজ্বলা পুরোনো ত্রিপল

এখন তোমার মাঠে বাঁশিদের উৎসব হবে

এবার হারিয়ে যেতে দাও

এই বসন্তে আমি ধুলো-ওড়া পরুষ চাদর

নিজের কবরশীর্ষে লেপে দেবো আবির যেমন...

একক

২২ মার্চ ২০১৯

সিগন্যালেতে একটু সোলো -

দুই স্টেশনের মাঝবরাবর,

হঠাৎ নেবে,

জলের

ধারে বসার। শ্যাওলা, পানা,

এদিক ওদিক, সবুজবরণ

পানকৌড়ি দুটি; একটু দূরে

রেল-

কলোনি, মধ্যে ব্রাউন

চাষের জমি,

শুকনো বাতাস উর্ণা সুতির টানে;

পোয়াতি দুই হাঁসজোড়াদের,

একটিকে বেশ ধরছে মনে,

আকাশি লোম,

হলদে

পালক - পাটকিলে চোখ,

খড়ের মধ্যে ঘরে,

উঠছে ধোঁয়া,

বুকের

নরম মাংস জুড়ে -

মাত্রাবৃত্ত;

আর কিছুনা, এমনি এমনি খিদের।

এমন দিনেই, বছর পঁচিশ
পিছিয়ে গেলে, স্যারের
বাড়ি কী যেন
এক
হল্লা সেরে,
ছু মন্তর দুইটি প্রাণী
বদের ধাড়ি, কোথায় গ্যালো,
কোচিং কেটে ফী-রোজ একী
অশৈল সব! দুই বাড়িতেই
ঝঞ্ঝাবর্ত,

নরম ঘাসের তে ত লা কাশ,
আকাশ দেখা
রেল কলোনির অনেকানেক
দূরের,
দুইটি বুকে মিলতোনা ঠিক,
বামঘেঁষা তুই
তখন থেকেই, আমার হাতে

মাত্রাবৃত্ত, আক্ষরিকের একটু পরে,
তখন থেকেই -,
আর কিছুনা, এমনি এমনি খিদে।

বছর পঁচিশ, খুববেশিদিন?

এইতো আবার সিগন্যালেতে

ঝাঁপ দিয়েছি।

ন'টা ষোলো ফেরার লোকাল,

এইতো আবার হাঁস

জোড়াদের, হুশ তাড়ালেই

রাগের সুরে উঠবে বেজে;

আক্ষরিকের -

একটু দূরে, যতটা তুই মাত্রাবৃত্তে,,

কিম্বা আমার এমনি এমনি খিদেয়।।

টিম

২৩ মার্চ ২০১৯

আমাদের পায়রার খোপ, আমাদের ঘোরানো হাতলে
চাপ খায় শুখা বারসোপ রঙমাখা ছায়া সরে গেলে
এখনই উদোম চাঁদ বেয়ে উঠে যাবে ডানা ঝাপটিয়ে
শুভ্র চাদরে ঢাকা ভাঙা খুলি শিশুদের সারি
পাপের কিনারা নেই কোন। ঢেউ আছে, গ্রাহ্য সীমানা
পিঁপড়ের মত মরে যাও, রঙ ছুটে চলে তালকানা

এই ভালো, ফুটপাথে জুতোর পাশটি ঘেঁষে বসে
টুপটাপ করে প্রেম ঝরে পড়ে মাসকাবারেই
পিচকারি চুঁয়ে পড়ে টলমল বিদ্রোহ দিশি
আকাশেও মিসাইলে রঙ ঢেলে স্বপ্ন শোভন
ক্যাবিনেটে সদাশয় বাণিজ্যে দড় ছোট তারা
রঙিন পিঁপড়েদল দোল খ্যালে সহ্য সীমায়।

অ্যাক্রস্টিক গুচ্ছ #১

হোলি হ্যায়... হিক!

রবাহূত

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০

ওধারে উদিত চাঁদা ছাতের উপরে
রেকাবীতে ভাং লাড়ু সাজিতেছে ঘরে
গৃহে গৃহে কামসিন কলিরা সাজিছে
হরেদরে রবি শানু স্পিকারে বাজিছে
বাতায়নে পরনারী স্মৃতিবিষে পলি
সীমানায় সামিয়ানা আজি হ্যাপি হোলি

খোলতাই চুড়িদার
লবেজান ভারী
দ্বারে দ্বারে কিমাকার
রসেবশে দ্বারী
খোলতা খোঁয়াড়ী ভেঙে খোশবাশ খোকা
ললনা কলিজা মাঝে দিবে হাওয়া ঝোঁকা

লাগিছে লগন রাধা হতেছে মগন
গহন চাঁদের হাটে ধূঁয়াটে গগন
লোহিত হতেছে আঁখি ডুবুডুবু পাড়া
যেমতি অবনী নাহি শুনে কড়ানাড়া
দোরোখা কলিকা জ্বলে ধিকিধিকি হুঁকা
লড়ে আঁখি পাড়াভরা অমিতাভ রেখা

স্থলে জলে বালিকারা

লেজে ক্রীড়া করে

জলাধিপ ভাঙমতী

লেনদেন ঘরে

বহে ধুম কোহলিক

নন্দন চরে

তদ্‌গত বাবা বাছা

লেখাপড়া ছাড়ে

খোশবাই আজি ছেড়েছে মহান

লবি কেরে বিরিয়ানী

দ্বারে দ্বারে আজি প্রখর প্রসূন

রহেসহে লালপানি

খোয়াবে খোঁয়াড়ে বেলা বহে গেল - হাসে একা বোকা ফাঁকা গলি

লবেজান প্রাণ হ্যাঙোভার কালি আজি ছিল হ্যাপি হোলি।

হোলি হ্যায়.... হিক।

অ্যাক্রস্টিক গুচ্ছ #২

দোলের পদ্য

রবাহূত

২১ মার্চ ২০১৯

তোষক তক্তপোষে জাজিম ফরাস আলবোলা
মাকারিনা ঝাকানাকা সঙ্গীতে সব ঝালাপালা
রগুবীর রক্কে করো রং নিয়ে আসে আদেখেলা

ঝামেলা বেকার বাপু ছায়াঘরে তবু ছলাকলা।
উড়ন্ত উড্ডীন দু'গুলিতে কেশরী বালম
এদানী ঝিমিয়ে আছে নেশাড়ুর কানাঘুষো দম
রহে সহে ভিজিয়েছো গলা আর অধর নিদাগ

দোধারা অশনিখানি স্মৃতিজালে ধরা পড়ে কম।
লেখা আছে কাগজেও মগজের কিসে উপশম

মরমে সে পশে তবু দরোজার ঘন্টি নীরব
রঙ্গিলা বাঁশি থেকে অহেতুক বিকালের ভ্রম।
মধুবায়ু দিলে পরে ফুরফুরে মনে পড়ে সব
রিরংসু অপরাধে ভুলেছিল শিখে নেওয়া ছক
আনখ যাঞ্চা করে বেমালুম চেপে গেছে নাম

ওপারে মুখর হল জলসার বেদম গায়ক
ঠেসাঠেসি ভীড় জুড়ে সহসা কী প্রাণের আরাম।

আদতে এ সব কিছু কুড়ি কুড়ি বছরের পার
মাখো মাখো পরিপাটি জলসা বা নীলরঙা খাম
রভসে গোঙায়ে লেখা পদে পদ জোছনায় মিল

দুঃশীল সময়েরা গাপ করে বলেছে হারাম।
খবরে বলেনি কিছু কবে গেছে ইহাদের দিন

রাতে শুধু দু'পেয়ালা কম পড়ে, কখনো প্রাচীন
তেএঁটে ঘড়ির থেকে ব্যাটারিটি খুলে নিতে হয়
রগড় চলেছে যেন ঘুরে ফিরে বছরে রঙীন

গাফিল আদবহীন দোলগতি গুটিগুটি ক্ষীণ
নগরে কীর্তন করে, ঋতুগত কিছু পাপ ক্ষয়।

অ্যাক্রস্টিক গুচ্ছ # ৩

দোলের পদ্য

রবাহূত

২১ মার্চ ২০১৯

তোড়ায় সাজিয়ে এই সন্ধ্যার ঘুণ লাগা পটে-
মায়ার আদরটুকু এঁকে দিলে চর জাগা নদী
রয়ে সয়ে ঢেকে দেয় এ হাওয়ার ত্রস্ত বৈদ্যুতিন ঘ্রাণ।

ঝাপটানো ডানা মুড়ে পংক্তিতে মুখোমুখি লেখার সুযোগে
উড়িয়ে দিয়েছো কত অক্ষর অযথার লজ্জময় বিধুর শতক-
এই পারে আজও বসে কথকতা, রাসের আসর
রম্যগীতিকা লেখে ফি-বছর ঋতুদের নামে।

দোয়া করে দীর্ঘ আলাপে তারা; রাধিকার ভেঙে যাওয়া প্রেম
লেখা যেন থাকে তার বিলাপেরা ক্ষয়াটে পাথরে-

মরমী মাঝিরা দেখে মাঝ্‌গাঙে শ্যাওলায় জড়ানো পাহাড়
রন্ধ্রে রেখেছে তার ক'হাজার বছরের স্রোত
মসৃন জলদাগ রয়ে গেছে ভাটিয়াল খর কলতানে
রিনিরিন সচকিত যেমন কাব্যে লেখা আছে
আনে তারা ঋতু বুঝে, রাগরূপ চিনে।

ওজরে ও অজুহাতে রং লাগে বনে উপবনে,
ঠেস দিয়ে কথা বলে অনাগত খরার প্রখর,

আজকাল এরকমই, যেরকম আবহমানতা-
মাঝে সাঝে অন্যথা সন্ধ্যার আয়েসী আলোতে,
রং গুলি ধরে রাখে পাতাদের করুণ ম্লানিমা।

দুঃসময়ের গান সালতামামির দিনে ঋতু
খর রোদে হাওলাত নিয়ে থাকে টিপসই রেখে।

রাসের আসর বসে এই পারে, এখনো এ দোয়া করে লোক
তেচোখো মাছের মত নাছোড়বান্দা যার প্রেম
রয়ে যায় যেন এই নদীজলে, বনতলে, পূর্নশশীতে।

গাঙশালিখের দেশে, শাপলা শালুক ফোটা বিলে
নগরের ধারে যেন থাকে এই পটে আঁকা মায়া।

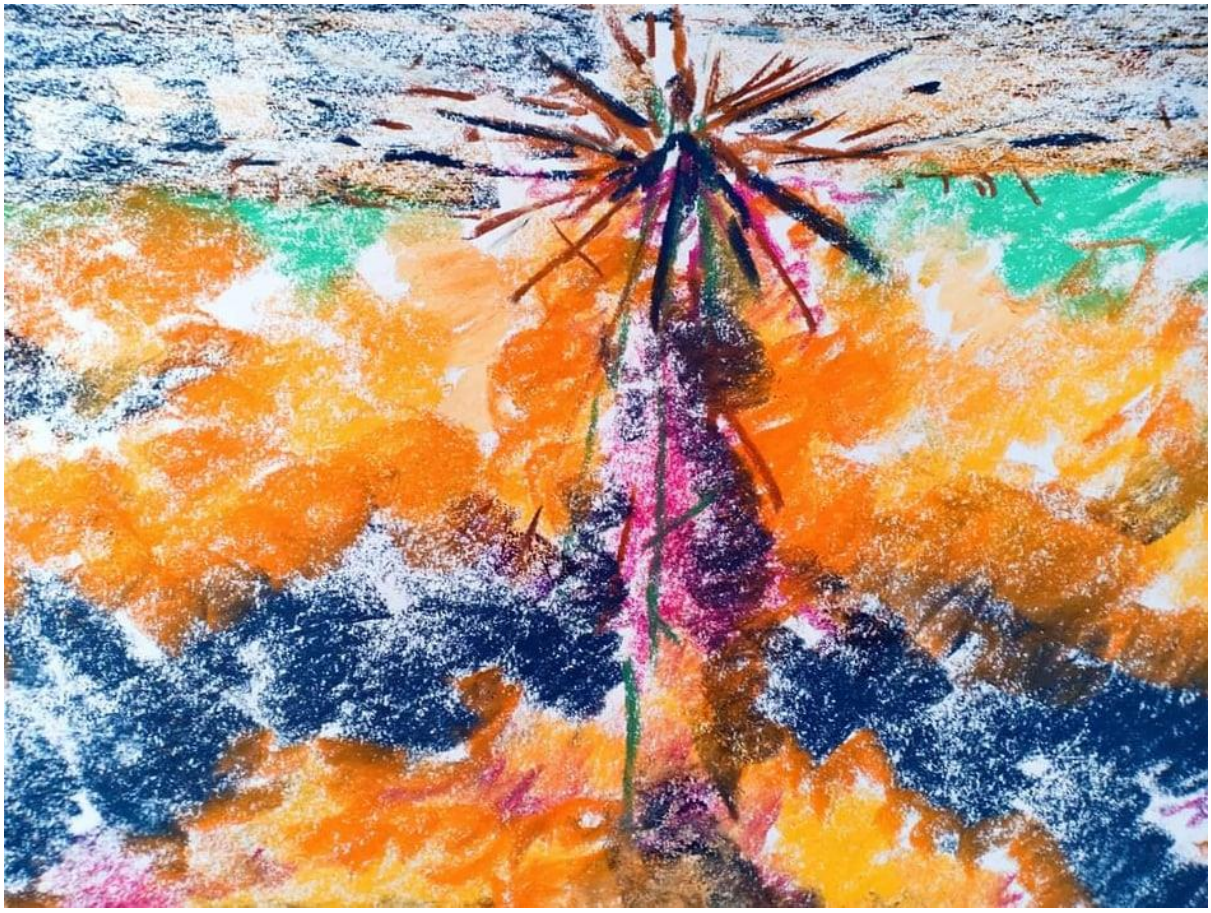

ছবিঃ বিনায়ক রুকু